নবীজির ﷺ পদাঙ্ক অনুসরণ

ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

নবীজির (ﷺ) পদাঙ্ক অনুসরণ

নবীজির (ﷺ) পদাঙ্ক অনুসরণ

মূল
ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ)

ইংরেজি অনুবাদ
আবু রুমাইশাহ

বাংলা অনুবাদ, পরিমার্জন এবং সম্পাদনা
সীরাত অনুবাদক টিম

শর'ঈ সম্পাদনা
আবু মুহাম্মাদ
জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
শিক্ষক, জামিয়া হোসাইনিয়া দারুল উলুম, রুপনগর, মিরপুর, ঢাকা

سيرة

সীরাত পাবলিকেশন

নিশ্চিন্তে, ঝামেলামুক্ত, সুন্দর একটা জীবনের স্বপ্ন ফেরি করা এই আমাদের জীবনগুলোর ভিড়ে-

কারাগারের অন্ধকার ঘরে, রিফিউজি ক্যাম্পে অনিশ্চয়তায়, প্রিয়জন হারানোর বেদনায়, আমাদের অবহেলায়, নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জীবনগুলো। ভালো থাকুক, তাঁদেরও একটা সুন্দর জীবন হোক। আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযাত যেন তাঁদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

সূচী

শর'ঈ সম্পাদকের কথা

রাসূল ﷺ ছিলেন "জাওয়ামিউল কালিম" তথা অল্প কথায় অধিক মর্ম প্রকাশক। এই মহা মানবের প্রতিটা কথায় লুকিয়ে আছে উম্মাহর জন্য 'রহমাহ' হয়ে আসা সফলতার মূলমন্ত্র, আত্মার খোরাক, ইহকাল ও পরকালে সাফল্যলাভের উপদেশ! তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীগুলো ছিলো পরশ পাথরতুল্য। যারাই তা মেনে নিয়েছেন, সে অনুপাতে জীবনকে ঢেলে সাজিয়েছেন, মুহূর্ত পূর্ব জাহিলী, বর্বর ও নরকপ্রান্তে উপনীত সেই মানুষগুলো পৌঁছে গেছেন ইতিহাসের স্বর্ণশিখরে। তাঁর প্রতিটা কথা, কর্ম ও সমর্থন সর্বকালেই সকল শ্রেণী-পেশা মানুষের জন্য পথনির্দেশক। চির মুক্তির দিকে আহবায়ক। পাঠকের হাতে সমর্পিত বইটি এমন একটি কথা বা হহাদীসেরই ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাত্র।

বালক সাহাবি ইবনে আব্বাস ؓ। রাসূলের সাথে উটের উপর বসা। প্রিয়নবী স্নেহভরে ডাকলেন, "বৎস! আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা বলে দিব, যা মেনে চললে তুমি উপকৃত হবে? প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে...?" এরপর তিনি এক এক করে ১২ টা নসীহত করেন। অবিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া ব্যক্তি যেভাবে অনুজদের উপদেশ দেয়, ঠিক সেভাবে রাসূল বলছেন, আর বালক সাহাবি তা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। এ যেন সফলতার ১২ টি ধাপ, ১২ টি সিঁড়ি। মেধাবী ও বিচক্ষণ সাহাবি ইবনে আব্বাস ؓ তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। ফলে তিনি জীবনের সুখটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করেছেন।

রাসূলের সেই নসীহতনামাকে বর্ণনা করেছেন অনেক মুহাদ্দিস। অনেক ওয়ায়েজ। কিন্তু ইবনে রজব রহিমাহুল্লাহ একটু ভিন্নপথে হাটলেন। একটু ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করলেন। তিনি ১২ টি নসীহতকে পৃথক পৃথক শিরোনামে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতিটা শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন অন্তত দশটি করে চমৎকার সব বাণী ও কাহিনী। কুর'আন-সুন্নাহ এবং বুজুর্গ ব্যক্তিদের বাস্তব ঘটনা ও উপমা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন নসীহতগুলো মর্মকথা, উপকারীতা ও গ্রহণযোগ্যতা। লেখক তার বইটির নাম রেখেছেন "নূরুল ইকতিবাস", যার বাংলা অনুবাদ "নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণ।"

বইটি মূলত ইংরেজি থেকে অনূদিত। তবে আমি আরবিটা পড়েছি। এবং খুব যত্মসহকারেই অনুবাদকপি মূল বইটির সাথে মিলেয়ে নিয়েছি। তবে ইংরেজি ভার্সনটাতে অতিরিক্ত কিছু পরিশিষ্ট ছিলো, যা উপকারি মনে হওয়ায় অনুবাদেও

সংযুক্ত করা হয়েছে। কিছুকিছু জায়গায় আমাদের মত পাঠকদের ঘটনা কিংবা বর্ণনায় অসম্পষ্টতা বা প্রশ্ন থাকতে পারে ভেবে টীকা সংযোজন করা হয়েছে। আর রেফারেন্স এর ক্ষেত্রে আমরা আরবী ও ইংরেজি ভার্সনেরই ইত্তিবা করেছি।

বইটি পড়তে গিয়ে মনে হলো দুইটি বিষয় একটু খোলাসা করে দেওয়া উচিৎ। কেননা বিষয় দুইটি নিয়ে আমাদের ধর্মচর্চাঙ্গণে বেশ বিতর্ক আছে। কিংবা অজ্ঞতার কারণে কেউ কেউ অযথা বিতর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রথম বিষয়ঃ কিছু মানুষের ধারণা, "অলি-আউলিয়াগণের কারামত সত্য নয়। ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই।" তাদের দাবি, "কারামত আর মু'জিযা একই। এবং তা কেবল নবী-রাসূলগণ থেকেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।"

আসলে উনাদের বিশ্বাস কিংবা বক্তব্য সত্য নয়। বরং তা কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের থেকে প্রকাশিত কারামত সত্য।

কারামত বলা হয় নেক ও মুমিন লোকদের থেকে শরীয়ত মু'আফিক অলৌকিক কিছু প্রকাশ পাওয়া। সেটা দীনের বিজয়, বাতিলের পরাজয়, কোনো বিপদ দূর কিংবা নেক লোকদের ইচ্ছে পূরণের কারণেও হতে পারে। হতে পারে আল্লাহর নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেস্যেও।

কিছু প্রমাণঃ

এক,

মারইয়াম ﷺ এর যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয়, তখন তিনি দূরে নির্জন একটি জায়গায় চলে যান। সেখানে একটি মরা খাল আর শুকনো খেজুর গাছ ছিলো। তিনি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। এমন সময় জিব্রাইল ﷺ তাকে ডেকে বললেন, পেরেশান হয়ো না। আল্লাহ আপনার জন্য খালে পানি প্রবাহিত করেছেন। শুকনো গাছে পরিপক্ক খেজুর দান করেছেন। আপনি তার ঝুকে পড়া পাতা ধরে ঝাকা দিলেই তা ঝরঝর করে পড়বে। এটা ছিলো মারইয়াম এর কারামতি। আর তিনি যে নবী ছিলেন না, এ ব্যাপারে সবাই একমত।

দুই,

আল্লাহ তা'আলা মারইয়াম ﷺ-কে উত্তমভাবে লালন-পালন করার জন্য তাঁর খালু যাকারিয়া ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে দিলেন। মারইয়াম মিহরাবের নিজ কক্ষে থাকতেন। যাকারিয়া ﷺ যখনই মারইয়াম ﷺ এর কক্ষে প্রবেশ করতেন তখন

তার কাছে বিভিন্ন অমৌসুমী ফল-ফলাদি দেখতে পেতেন। গ্রীষ্মের ফল শীতকালে আর শীতকালের ফল গ্রীষ্মে। এ ফলমূল দেখে জাকারিয়া ﵇ আশ্চর্য হয়ে যেতেন; কারণ তিনি নিজে এ ফল এনে দিতেন না এবং অন্য কেউও এনে দিত না। এটা ছিলো মারইয়াম ﵍-এর কারামাত।

তিন,

আসহাফে কাহাফের ঘটনাটিও বড় আশ্চর্যের। অলৌকিক। কোনো মানুষের পক্ষেই একটানা ৩০৯ বছর ঘুমানো এবং জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার মুখ ছিলো প্রশস্ত। কিন্তু সূর্যের আলো তাতে ঢুকত না। এটা তাদের কারামাত।

চার,

সুলাইমান ﵇ চাইলেন রানী বিলকিসকে চমকে দিবেন। তো তিনি তার অনুসারীদের বললেন, কে আছে যে তার সিংহাসন তার আগমনের পূর্বে এখানে উপস্থিত করতে পারবে? তখন এক ব্যক্তি বললেন আমি আপনার চোখের পলক পরার আগেই তা হাজির করে দিবো। এবং তাই হলো। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এ লোক সুলাইমান ﵇-এর সহচর ছিলেন, যার নাম ছিল আসেফ ইবনে বরখিয়া। সে হিসেবে এটা একটি কারামত ছিল।

পাঁচ,

ইবরাহীম ﵇ স্ত্রী সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক অত্যাচারী শাসক ছিল। সে জানতে পারলো যে ইবরাহীম নামক এক ব্যক্তি এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে তার শহরে প্রবেশ করেছে। তখন তাদের ডাকা হলো। একপর্যায় সারাকে ডেকে পাঠালেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অসৎ নিয়তে অগ্রসর হলে সারা উযূ করে সালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমিও তোমার উপর এবং তোমার রসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হতে আমার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফিরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, আয় আল্লাহ্! এ যদি মারা যায় তবে লোকে বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া

স্বরূপ দান কর। সারাহ ইবরাহীম ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসেবে দিয়েছেন।

ছয়,

পাহাড়ের গুহায় আটকে যাওয়া তিন যুবকের ঘটনাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাদের তিন জনের প্রত্যেকেই স্বীয় সৎকর্মের অসিলা দিয়ে দু'আ করেন। ফলে পাথরটি আপনা আপনি সরে যায়। তারাও মুক্তি পায় এক ভয়াবহ বিপদ থেকে।

সাত,

জুরাইজ নামের এক আবেদ নফল ইবাদাতে ছিলেন। এমন সময় তার মা এসে তাকে ডাকেন। কিন্তু ইবাদাতে থাকায় তিনি তার ডাকে সাড়া দেননি। এদিকে মা রাগ হয়ে বলেন, আল্লাহ যেন তাকে পতিতাদের মুখ না দেখিয়ে মৃত্যু না দেন। এর অনেকদিন পর এক রাখালিনী বাচ্চা প্রসব করে। সে বলল এই বাচ্চার বাপ জুরাইজ। লোকেরা জুরাইজের উপর ক্ষেপে গেলো। ভণ্ড বলে অভিযোগ করলো। তো জুরাইজ তা জানতে পেরে বললেন, ঐ নবজাতক শিশুটিকে নিয়ে আসুন। এরপর তিনি বাচ্চাকে বললেন, তোমার পিতা কে? বাচ্চা বলল, অমুক রাখাল আমার বাপ।

আট,

অতীতকালে এক বাদশার এক জাদুকর ও গণক ছিল। যখন সে গণক বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হলো তখন সে বাদশাকে বলল, আমাকে একটি বুদ্ধিমান বালক দিন যাকে আমি এ বিদ্যা শিক্ষা দেব। সুতরাং বাদশা সে রকম একজন বুদ্ধিমান বালক খোঁজ করে তার কাছে সমর্পণ করলেন। ঐ বালকের পথে এক পাদরিরও ঘর ছিল। বালকটি পথে আসা যাওয়ার সময় সে পাদরির নিকট গিয়ে বসত এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। এভাবে তার আসা-যাওয়া অব্যাহত থাকে।

একদা এ বালকটির যাওয়ার পথে এক বৃহদাকার জন্তু (বাঘ অথবা সাপ) বসে ছিল যে মানুষের আসা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। বালকটি চিন্তা করল, আজকে আমি পরীক্ষা করব যে জাদুকর সত্য, না পাদ্রী। সে একটি পাথরের টুকরো কুড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ তা'আলা! যদি পাদ্রীর আমল তোমার কাছে জাদুকরের আমল থেকে উত্তম এবং পছন্দনীয় হয়, তাহলে এ জন্তুকে মেরে ফেল, যাতে মানুষ চলাচল করতে পারে। এ বলে বালকটি পাথর ছুড়লে জন্তুটি মারা গেল। এবার বালকটি পাদ্রীর নিকট গিয়ে সব খুলে বলল। পাদ্রী বললেন, হে বৎস!

এবার দেখছি তুমি পূর্ণ দক্ষতায় পৌঁছে গেছো। এবার তোমার পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। কিন্তু এ পরীক্ষা অবস্থায় আমার নাম তুমি প্রকাশ করবে না। এ বালকটি জন্মান্ধ ও ধবল প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাও করত; তবে তা আল্লাহ্ তা'আলার ওপর বিশ্বাসের শর্ত রেখেই করত। বালকটি এ শর্তানুযায়ী বাদশার এক সহচরের অন্ধ চক্ষুকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করে ভাল করে দেন। বালকটি বলত যে, আপনি যদি ঈমান আনেন তাহলে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করব; তিনি আরোগ্য দান করবেন। সুতরাং সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি রোগীকে আরোগ্য দান করতেন। এ খবর বাদশার নিকট গেল, সে বড় উদ্বিগ্ন হলো। কিছু সংখ্যক ঈমানদারকে সে হত্যাও করে ফেললো। আর এ বালকটির ব্যাপারে তিনি কয়েকটি লোককে ডেকে বললো যে, এ বালকটিকে উঁচু পাহাড়ের ওপর নিয়ে গিয়ে নীচে ফেলে দাও। বালকটি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলে পাহাড় কাপতে লাগল। সে ছাড়া সকলেই পাহাড় থেকে পড়ে গেল। বাদশা তখন বালকটিকে অপর কিছু লোকের কাছে সমর্পণ করে বললো, একে একটি নৌকায় চড়িয়ে সমুদ্রের মাঝে নিক্ষেপ কর। সেখানেও বালকটি বেঁচে গেল। এবার বালকটি বাদশাকে বলল : যদি আপনি আমাকে মারতে চান তাহলে এর সঠিক পদ্ধতি হলো একটি খোলা মাঠে লোকদেরকে সমবেত করে "বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম" বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষপ করুন। দেখবেন আমি মারা গেছি। বাদশা তাই করলো। ফলে বালকটি মৃত্যুবরণ করল।

এটা দেখে সে ঘটনাস্থলেই লোকেরা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল যে, আমরা এ বালকটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশা আরো অধিক উদ্বিগ্ন হলো। অতএব সে তাদের জন্য গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালাতে আদেশ করলো। অতঃপর হুকুম দিলো যে, যে ব্যক্তি ঈমান হতে ফিরে না আসবে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ কর। এভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরা আসতে থাকল এবং আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে থাকল। পরিশেষে একটি মহিলার পালা এল, যার সঙ্গে তার বাচ্চাও ছিল। সে একটু পশ্চাদপদ হলো। কিন্তু বাচ্চাটি বলে উঠল, আম্মাজান! ধৈর্য ধরুন। আপনি সত্যের ওপরে আছেন। সুতরাং সেও আগুনে পুড়ে শহীদ হয়ে গেল।

নয়,

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'জন সহাবী অন্ধকার রাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে বের হলেন, তখন তাদের সঙ্গে দু'টি বাতির মত কিছু তাদের সম্মুখ ভাগ আলোকিত করে চলল। যখন তাঁরা আলাদা হয়ে গেলেন তখন প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটি বাতি চলতে লাগল। তাঁরা

নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছা পর্যন্ত। (বলা হয়ে থাকে, এরা হলেন উব্বাদ বিন বিশর এবং উসাইদ বিন হুজাইর)

আলোচ্য ঘটনাগুলোর কেউ কিন্তু নবী-রাসূল ছিলেনা না। তথাপি তাদের থেকে অলৌকিক যা প্রকাশ পেয়েছে, তা কারামত ছাড়া আর কি বা হতে পারে? ইমাম আবু জা'ফর আত্বহাভী ﷺ বলেন, "বিশ্বস্ত সূত্রে আউলিয়াগণ থেকে প্রকাশিত কারামাতকে আমরা বিশ্বাস করি।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, "আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্যতম একটি আকিদা হলো আউলিয়াগণ থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ হওয়াকে সত্যায়িত করা। এটা যেমন সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবেঈনগণের যুগে প্রকাশ পেয়েছে, অনুরূপ কিয়ামত পর্যন্ত তা যে কোনো পরহেজগার মুমিনের থেকে প্রকাশ পেতে পারে।"

এখানে মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পার্থক্য তুলে ধরা হলোঃ

১। মু'জিযা নবুওয়তের দাবীর সাথে সম্পৃক্ত। আর কারামতের ব্যাপারে এ দাবী থাকতে পারে না।

২। মু'জিযা নবীর ইচ্ছাধীন। তিনি সেটা দেখাতে ও প্রকাশে সমর্থ হন। পক্ষান্তরে কারামত দেখাবার ব্যাপার নয়।

৩। মু'জিযা হলো চ্যালেঞ্জ মূলক। কিন্তু কারামাত এমন নয়।

৪। মু'জিযা প্রকাশের জন্যই। কিন্তু কারামত প্রকাশ বা বলে বেড়ানোর বিষয় না।

কারামত মূলতঃ নবীর মু'জিযারই অংশ। নবীর অনুসরণ না করলে কারামত কখনো হাসিল হতে পারে না। যারা নবীর অনুসরণ করবে না তারা যদি এ ধরণের কিছু দেখায় তবে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, সেটা কোন যাদু বা সম্মোহনী অথবা ধোঁকার অংশ।

দ্বিতীয় কথাঃ

যয়ীফ হাদীসের দ্বারা ফাযায়েলে আ'মাল তথা 'আমলের ফজীলতে গ্রহণযোগ্য কি না এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে ফাযায়েলে আ'মালের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব হিসেবে আমল করা জায়েয। কিন্তু তিনটি শর্তের ভিত্তিতে! সহিহ বুখারির প্রসিদ্ধ ও অদিতীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র লিপিকার আল্লামা ইবনুল হাজার আসকালানী 'আল ইসাবাতু ফী তাময়ীজিস সাহাবা'তে বলেন, "তিনটি শর্তের ভিত্তিতে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে।

ক, অত্যাধিক পরিমাণের যয়ীফ না হতে হবে।

খ, হাদীসটি একদম অপরিচিত না হতে হবে।
গ, হাদীসের আমল যেন ছুটে না যায়, সে সতর্কতা হিসেবে আমল করা হবে। এ হিসেবে নয় যে এটার দ্বারা আমলটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত।"

"হুকমুল আমালি বিল হাদীসিস যায়ীফ' কিতাবের লেখক বলেন, "সকল আলিমের মতেই হালাল, হারামের বিধান সাব্যস্ত করা ছাড়া ফজীলতের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের আমল গ্রহণযোগ্য।"

আল্লামা ইমাম নববী ؒ ও মোল্লা আলী কারী ؒ বলেন, ফাজায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐক্যমত রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সুফয়ান ছাওরি ؒ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক ؒ, আব্দুর রহমান বিন মাহদী ؒ, সুফয়ান বিন উয়াইনাহ ؒ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ؒ, আহমাদ ইবনে হাম্বাল ؒ, হাফিয ইবনে কাছির ؒ, জালালুদ্দিন মহল্লী ؒ, জালালুদ্দিন সুয়ূতি ؒ প্রমুখ।

বিবেকসম্পন্ন এবং সত্যাগ্রহী মানুষের জন্য একদুটি দলীলই যথেষ্ট ছিল। এরপরেও যদি কারো দলীলতেষ্টা না মিটে, তাহলে সূত্রে বর্ণিত গ্রন্থগুলো বিস্তর মুতালা'আর অনুরোধ জানাচ্ছি।

বইটির অনুবাদে, প্রকাশে যারা যেভাবে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য, সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। বিশেষত সীরাত পাবলিকেশন এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে। বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে মনমুগ্ধকর এমন একটি বই তুলে দিতে পারায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইসলাম ও উম্মাহর খেদমতে আল্লাহ তাদের সঠিক মানহাজের উপদ দায়েম ও কায়েম রাখেন।

একটু বই নির্ভুল ও প্রশ্নমুক্ত করার জন্য প্রকাশক, অনুবাদক এবং শরীয়ী সম্পাদক কারোরই সততা ও আন্তরিকতার ঘাটতি থাকে না। তবু অজ্ঞতা, অসতর্কতা ও অযোগ্যতার কারণে ভুল থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যদি এমন কোনো ভুল কোনো বিজ্ঞ পাঠকের নজরে পড়ে, তাহলে সর্বাগ্রে প্রকাশন সংশ্লিষ্ট কাউকে অবগত করার অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ, শুদ্ধ ও সত্য গ্রহণে আমাদের আন্তরিক পাবেন।

আবু মুহাম্মাদ
জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
শিক্ষক, জামিয়া হোসাইনিয়া দারুল উলুম, রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। এমন বিশুদ্ধ ও বরকতময় প্রশংসা, যা আমাদের প্রতিপালক ভালোবাসেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। এমন প্রশংসা, যা তাঁর মর্যাদার মাহাত্ম্য ও সত্তার সুউচ্চতার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাথিদের উপর।

হানাশ আস-সান'আনির সূত্রে ইমাম আহমাদ হাদীস বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন,

> "আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসে থাকা অবস্থায় তিনি বললেন, 'হে বালক, তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিই, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার উপকার সাধন করবেন?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি ﷺ বললেন, 'আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে জেনো, তাহলে তোমার বিপদের সময় তিনি তোমাকে জানবেন। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহরই কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। যা যা ঘটবে, (তা লেখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একত্র হয়ে যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ। বিজয় আসে ধৈর্যের মাধ্যমে; কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি; আর কাঠিন্যের সাথে রয়েছে সহজতা।"[১]

---

[১] আহমাদ : ২৮০৩; সহীহ

এভাবেই হানাশ থেকে এবং আরও দুটি মুনকাতি সনদ থেকে ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সনদ থেকে আসা শব্দগুলোর মধ্যে তিনি সমতা রক্ষা করেননি।

শুধু হানাশের সূত্রেও তিনি এটি বর্ণনা করেছেন, যার শব্দগুলো হলো, "হে বালক, আমি তোমাকে কিছু কথা শোনাব। আল্লাহকে হেফাজত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহরই কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহরই দিকে ফিরবে। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে। পুরো জাতি একত্র হয়ে যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না।"[২]

তিরমিযিতে আরেকটি অনুরূপ বর্ণনায় এসেছে, "আমি তোমাকে কিছু কথা শোনাব। আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে। জেনে রেখো, সমগ্র জাতি যদি একত্র হয়ে তোমার কোনো উপকার সাধন করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর যদি একত্র হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে।"[৩]

হাফিয আবু আব্দুল্লাহ ইবনু মান্দাহ ﷺ বলেন, "এই হাদীস ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বেশ কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি এর মধ্যে বিশুদ্ধতম... এর বর্ণনাসূত্র প্রসিদ্ধ এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল।"

আমি বলি, এই হাদীস ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন তাঁর ছেলে আলি, আতা[৪] এবং ইকরিমাহ[৫]। এ ছাড়াও তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন গুফরাহর[৬] আযাদকৃত দাস উমার, আব্দুল মালিক ইবনু

---

[২] আহমাদ : ২৬৬৯-২৭৬২; সহীহ
[৩] তিরমিযি : ২৫১৬; তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন।
[৪] আব্দ ইবনু হুমাইদ, ৬৩৪ (মুন্তাখাব); তাবারানি, আল-কাবির : ১১৪১৬
[৫] তাবারানি, আল-কাবির : ১১৫৬০
[৬] তাবারানি, আল-কাবির : ১১৫৬০

উমাইর[৭] এবং ইবনু আবি মুলাইকাহ[৮]। যদিও বলা হয় তাঁরা হাদীসটি সরাসরি শোনেননি। এই সবগুলো সনদই ত্রুটিপূর্ণ। এর কোনোটিতে কিছু শব্দ বেশি আছে, কোনোটিতে কিছু শব্দ কম আছে।

নবীজি ﷺ ইবনু আব্বাস ؓ-কে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আলি ইবনু আবি তালিব[৯] ؓ, আবু সাইদ আল খুদরি[১০] ؓ, সাহল ইবনু সাদ[১১] ও অন্যান্য সাহাবা[১২] থেকেও বর্ণিত আছে। এই সনদগুলোও ত্রুটিপূর্ণ। উকাইলি বলেছেন যে, এই হাদীসটির সকল সনদ দুর্বল (লাইয়্যিন), যার কোনো কোনোটি একটি অপরটি থেকে উত্তম।[১৩]

আমার মতে এ হাদীসের বিশুদ্ধতম সনদ হলো হানাশ থেকে বর্ণিত সূত্রটি, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এটি হাসান সনদ, যাতে কোনো ত্রুটি নেই। *শারহ তিরমিযি*তে আমি এর বিভিন্ন ইসনাদ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছি। তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো হাদীসটির অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা।

এই হাদীসে এমন কিছু উপদেশ ও নীতিমালা আছে, যা চূড়ান্ত রকম গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্বীনের মহত্তম ও উচ্চতম কিছু দিক নিয়ে এটি আলোচনা করেছে। এটি এতই সত্য যে, *সাইদুল খাতির* গ্রন্থে ইমাম আবুল ফারাজ ؒ বলেছেন,

> "আমি এই হাদীস নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমি এমনই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যে, আমি অস্থির বোধ করা শুরু করলাম।" তারপর তিনি আরও বলেন, "এই হাদীস সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা ও এ ব্যাপারে মানুষের বুঝের অভাব সত্যিই বেদনাদায়ক।"[১৪]

---

[৭] হাকিম : ৬৩০৩

[৮] তাবারানি, আল-কাবির : ১১২৪৩

[৯] কাদি তিন্নাওখি, আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১২

[১০] আবু ইয়ালা : ১০৯৯

[১১] কাদি তিন্নাওখি, আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১২; সুয়ুতি, আদ্দুররুল মানসুর : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৯; একে দারুকুতনির আফরাদ, ইবনু মারদাওয়াইহ, বায়হাকি ও আসবাহানির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

[১২] যেমন আবু আসিমের আস-সুন্নাহতে আব্দুল্লাহ ইবনু জাফার থেকে বর্ণিত, ৩১৫

[১৩] উকাইলি, আদ-দুয়াফা আল-কাবির : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৪; এই হাদীসের বিভিন্ন উৎসের জন্য পরিশিষ্ট এক দেখুন।

[১৪] আল-কারি, শারহু মিশকাত : খণ্ড ৯, ১৬১ পৃষ্ঠাতে বলেন, "'আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম' এ থেকে বোঝা যায় ইবনু আব্বাস ؓ ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রেখেছেন,

কথাগুলো মাথায় গেঁথে নিয়েছেন এবং সঠিকভাবে সেগুলো পৌঁছে দিয়েছেন। এই হাদীস তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন। এ ছাড়া বেশির ভাগ হাদীসই তিনি অন্য বর্ণনাকারীর মাধ্যম হয়ে বর্ণনা করেছেন। তবে সাহাবির মুরসাল হাদীস বলে সেগুলোকে গ্রহণ করা হয়। এর কারণ, তিনি নবীজি ﷺ-এর জীবদ্দশায় খুবই কমবয়সী সাহাবি ছিলেন। লেখক (বাগাওয়ি) বলেন যে, তিনি হিজরতের তিন বছর আগে জন্ম নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় তেরো বছর বয়সী ছিলেন। অন্য কারও মতে তাঁর বয়স ছিল পনেরো, আরেক মত অনুযায়ী দশ। এ সত্ত্বেও তিনি বিরাট আলেমে পরিণত হন এবং এই উম্মাতের জন্য জ্ঞানের সাগর হয়ে যান। কারণ, রাসূল ﷺ দু'আ করেছিলেন যেন তিনি প্রজ্ঞা, বুঝ ও সঠিক অর্থের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি দুইবার জিবরীল ﷺ-কে দেখেন এবং জীবনের শেষপ্রান্তে অন্ধ হয়ে যান। ৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে আয-যুবাইর رضي الله عنه-এর শাসনামলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিরাট সংখ্যক সাহাবা ও তাবিঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

"বালক" সম্বোধনটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কথার দিনে মনোযোগ দিতে উৎসাহ দিচ্ছেন। আল-আযকার গ্রন্থে এর পরের অংশ আছে এভাবে, "আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দেবো..." অর্থাৎ, এমন কিছু শিক্ষামূলক কথা, যা বিপদ দূর করতে ও নিয়ামাত লাভ করতে সহায়ক হবে।

অধ্যায় এক

আল্লাহকে হেফাজত করা

নবীজি ﷺ-এর কথা "আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন" এর অর্থ হলো আল্লাহর নির্ধারণ করা সীমা মেনে চলা, তাঁর অধিকার সংরক্ষণ করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা। এটি করার উপায় হলো আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, তা পালন করা; যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা পরিহার করা; আল্লাহ যে সীমা প্রদান করেছেন তা লঙ্ঘন করে হারামে পতিত না হওয়া।

অতএব, এই বাক্য থেকে সেই সকল দায়িত্ব পালন করা ও সেই সকল নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করাকে বোঝায়, যার কথা বলা হয়েছে আবু সালাবা ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীসে। রাসূল ﷺ বলেন,

> "আল্লাহ বিভিন্ন দায়িত্ব ফরয করেছেন, অতএব এগুলোতে শিথিলতা কোরো না। তিনি অনেক বিষয় হারাম করেছেন, অতএব এগুলোতে লিপ্ত হোয়ো না। আর তিনি সীমা স্থাপন করেছেন, তা লঙ্ঘন কোরো না।"[১৫]

উপরের এই সবকিছুই 'আল্লাহর সীমা সংরক্ষণ করার অন্তর্ভুক্ত, যা কুরআনের এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় :

> **"...যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণকারী..."[১৬]**

> **"এ হলো তা-ই, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল—প্রত্যেক আল্লাহ-অভিমুখী ও (গুনাহ থেকে) খুব বেশি হেফাজতকারীর জন্য। যে না দেখে[১৭] দয়াময় (আল্লাহ)-কে ভয় করত, আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য বিনয়ে অবনত অন্তর নিয়ে উপস্থিত হতো।"[১৮]**

---

[১৫] *দারকুতনি* : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৩, হাদীস নং ৪৩৮৬; তাবারানি, *আল-কাবির* : খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ২২১

[১৬] সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ১১২

[১৭] অথবা "...যারা গোপনে আর-রহমানকে ভয় করে..."

[১৮] সূরাহ কাফ, ৫০ : ৩২-৩৩

এই আয়াতে “হেফাজতকারী”র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর আদেশসমূহ সংরক্ষণ করে।[১৯] আরেক অর্থ হলো সেই ব্যক্তি, গুনাহের কারণে যার উৎকণ্ঠা তাকে তাওবাহ ও গুনাহ পরিত্যাগের দিকে নিয়ে যায়।[২০] এই আয়াতে উভয় অর্থই প্রকাশ পায়[২১]। এ ছাড়া যারা হাক্কুল ইবাদ বা আল্লাহর বান্দাদের অধিকার সংরক্ষণ করে, তারাও এ আয়াতের আওতায় পড়ে। এই সকল দিকই একটি মৌলিক অর্থকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

জান্নাতের নিয়ামাতের ব্যাপারে একটি হাদীসে বলা হয়েছে,

> “যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের তাঁকে দেখার জন্য আহ্বান করবেন, তখন পর্দা সরিয়ে দেওয়ার পর তিনি বলবেন, ‘স্বাগতম, হে আমার বান্দারা, যারা আমার অধিকার সংরক্ষণ করেছিলে, আমার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছিলে, আর আমাকে গোপনে ভয় করেছিলে; যারা প্রত্যেক অবস্থায় আমার প্রতি ভীত ছিলে।”[২২]

অতএব, উপরে বর্ণিত সকল বিষয় আল্লাহকে হেফাজত করার বিষয়ে ইবনু আব্বাস ﵄-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

১.১ সালাত সংরক্ষণ করা

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয় হেফাজত করতে হবে, তার একটি হলো দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

> **“তোমরা সালাতের হেফাজত করো, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাত...”[২৩]**

> **“...যারা তাদের সালাত সংরক্ষণকারী।”[২৪]**

---

[১৯] তাবারি থেকে বর্ণিত কাতাদাহ'র ব্যাখ্যা।

[২০] বায়হাকি থেকে বর্ণিত সাইদ ইবনু সিনানের ব্যাখ্যা। তাবারি থেকে বর্ণিত ইবনু আব্বাস, সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, মুজাহিদ ও উবাইদ ইবনু উমাইরের ব্যাখ্যা। সুয়ূতির *আদ-দুররুল মানসুর*।

[২১] তাবারানি ও অন্যান্য কর্তৃক উল্লেখিত।

[২২] ইবনু আবিদ্দুনিয়া, সিফাতুল জান্নাহ: পৃষ্ঠা ৫৩ এবং আবু নুয়াইম, সিফাতুল জান্নাহ: পৃষ্ঠা ৪১১, মুনযিরি, আত-তারগীব: খণ্ড ৪, ৩০৭ পৃষ্ঠায় বলেন, নবীজি ﷺ-এর হাদীস হিসেবে এটি মুনকার। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: খণ্ড ২, ৫২০ পৃষ্ঠায় ইবনু কাসির বলেন, “এটি মুরসাল যঈফ গারীব। এর ব্যাপারে সর্বোচ্চ যা বলা যায় তা হলো, এটি কোনো সালাফের উক্তি যা ভুল করে নবীজি ﷺ-এর নামে প্রচারিত হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।” হাদিউল আরওয়াহর ২৩৩ পৃষ্ঠায় ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, এটি নবীজির হাদীস হিসেবে সহীহ নয়।

[২৩] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৩৮

[২৪] সূরাহ আল-মা'আরিজ, ৭০ : ৩৪

নবীজি ﷺ বলেন, "যারা এগুলোর হেফাজত করে, আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা করেছেন।"[২৫]

আরেক হাদীসে আছে, "যারা এগুলোর হেফাজত করে, তা তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হবে।"[২৬]

১.২ পাক-পবিত্রতা হেফাজত করা

একই বিষয় পাক-পবিত্রতার ক্ষেত্রেও সত্য, কারণ এটি সালাতের চাবি।[২৭] নবীজি ﷺ বলেছেন, "মুমিন ছাড়া আর কেউই ওযুর হেফাজত করে না।"[২৮]

কারণ, বান্দা নিজের অজান্তেই ওযু ভেঙে ফেলতে পারে। ওযু রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকার অর্থ হলো অন্তরে ঈমান সঠিকভাবে প্রোথিত হয়েছে।

১.৩ শপথের হেফাজত করা

আল্লাহ যেসব বিষয় হেফাজত করতে আদেশ করেছেন, তার একটি হলো শপথ। কসম ভঙ্গ করার কাফফারার বিধান দেওয়ার পর আল্লাহ বলেন :

"এগুলো হলো তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ করো।

---

[২৫] মালিক : ২৬৮; আবু দাউদ : ৪২৫; নাসাঈ : ৪৬২; ইবনু মাজাহ : ১৪০১; ইবনু হিব্বান : ১৭৩২-২৪১৭ তে একে সহীহ বলেছেন; ইবনু আব্দুল বার্র, *আত-তামহিদ* : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৭; নববী, *খুলাসাতুল আহকাম* : ১৮৫৯; আলবানি, *সহীহ আত-তারগীব* : ৩৭০

[২৬] আহমাদ : ৬৫৭৬; তাবারানি, *আল-আসওয়াত* : ১৭৮৮; ইবনু হিব্বান : ১৪৬৭ ও ইরাকি, *তারহুত তাসরিব* : খণ্ড ২, ১৪৭ পৃষ্ঠায় একে সহীহ বলেছেন। মুনযিরি, *আত-তারগীব* : খণ্ড ১, ২৬৪ পৃষ্ঠাতে এর ইসনাদকে জাইয়্যিদ বলেছেন। *তানকিহুত তাহকীক* : খণ্ড ১, ৩০০ পৃষ্ঠাতে যাহাবিও এ কথা বলেছেন। *হাইসামি* : খণ্ড ১, ২৯২ পৃষ্ঠায় বলেন, "আহমাদের বর্ণনাকারীগণ সিকাহ"। আরনাউত একে *মুসনাদের* টীকায় হাসান এবং *ইবনু হিব্বানের* টীকায় সহীহ বলেছেন।

[২৭] আলি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, "পবিত্রতা হলো সালাতের চাবি। তাকবির তার (সালাতের বাইরের সকল কাজ) হারামকারী এবং সালাম ফেরানো তার হালালকারী।" তিরমিযি : ৩; এ ছাড়া জাবির رضي الله عنه থেকে (৪) এবং আবু সাইদ আল-খুদরি رضي الله عنه থেকেও (২৩৮) এটি বর্ণিত হয়েছে।

[২৮] আহমাদ : ২২৩৭৮-২২৪৩৩-২২৪৩৬; ইবনু মাজাহ : ২৭৭; দারিমি : ৬৫৫, সাওবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। *জামিউস সগির* : ৯৯৪ নং-এ সুয়ুতি একে সহীহ বলেছেন; *আমালিতে* মুনযিরি ইরাকির উদ্ধৃতি দিয়ে একে হাসান বলেছেন; আরনাউতের মতে সহীহ লি গাইরিহি; আলবানি, *সহীহুত তারগীব* : ১৯৭-৩৭৯

তোমরা তোমাদের শপথ হেফাজত করবে।”[২৯]

মানুষ অহরহ শপথ করে থাকে। এগুলোর একেকটি ভঙ্গ করা একেক পর্যায়ের গুরুতর পাপ। কখনো কসম ভাঙার কাফফারা দিতে হয়। কোনো ক্ষেত্রে খুব গুরুতর কাফফারা প্রয়োজন (কাফফারা মুগাল্লাযা)। আবার কিছু ক্ষেত্রে তালাক পতিত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শপথ রক্ষা করার ব্যাপারে সচেতন থাকে, নিশ্চয়ই তার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেছে।

সালাফগণ সতর্কতার সাথে নিজেদের শপথ রক্ষা করতেন। তাঁদের কেউ কেউ তো কখনোই আল্লাহর নামে কসম করতেন না। আবার কেউ কেউ শপথ ভেঙে গেছে ধরে নিয়ে কাফফারা আদায় করে দিতেন। ইমাম আহমাদ ﵀ মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় ওসিয়ত করেন যেন তাঁর পক্ষ থেকে কসম ভাঙার কাফফারা আদায় করা হয়। তিনি বলেন, “আমার মনে হয় আমি কোনো কৃত শপথ ভঙ্গ করেছি।”

বর্ণিত আছে যে, আইয়ুব ﵇ যদি কাউকে আল্লাহর নামে শপথ করতে শুনতেন, তাহলে অসাবধানতাবশত গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য তার পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করে দিতেন। এ কারণে তিনি যখন স্ত্রীকে এক শ আঘাত করার কসম করে বসেন, তখন আল্লাহ তাঁর জন্য সহজ পথ বের করে দেন।[৩০] কারণ, তিনি অন্যদের কসম হেফাজত করার ব্যাপারে সাবধানী ছিলেন। তাঁর এই বিশেষ বিধান অন্য মানুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণের মতভেদ আছে।

ইয়াযিদ ইবনু আবি হাবিব ﵀ বলেন, “আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, আরশ বহনকারীদের মাঝে একজনের চোখ থেকে নদীর মতো অশ্রু প্রবাহিত হয়। তিনি মাথা তোলার পর বলেন, ‘আপনি সুমহান! আপনাকে সেভাবে ভয় করা হয় না, যেমন ভয় করার আপনি যোগ্য।’ আল্লাহ বলেন, ‘তারপরও যারা আমার নামে মিথ্যা শপথ করে, তারা তা অনুধাবন করে না।’”

---

[২৯] সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৮৯

[৩০] “কিছু ঘাস নাও আর তা দিয়ে আঘাত করো। এবং শপথ ভঙ্গ কোরো না।” (সূরাহ সোয়াদ, ৩৮:৪৪)

যিহার এর কাফফারাঃ নিজ স্ত্রীকে কিংবা তার কোন অঙ্গকে মায়ের সাথে, কিংবা স্থায়ীভাবে বিয়ে হারাম এমন কোন মহিলার পৃষ্ঠদেশের সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করাকে আরবিতে যিহার বলে। এ কথার উদ্দেশ্য হলো মা ও মাহরামের সাথে মেলামেশা যেমন হারাম, ঠিক তেমনি স্ত্রীর সাথেও হারাম করা– শর'ঈ সম্পাদক

মিথ্যা শপথ করার ব্যাপারে খুবই কড়া ধমক এসেছে। অতিরিক্ত কসম করা, আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা– এগুলোর কারণ হলো আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা ও অন্তরে সম্মানের অভাব।

১.৪ মাথা ও পেট হেফাজত করা

যেসব জিনিস হেফাজত করা মুমিনদের অবশ্য কর্তব্য, তার মধ্যে রয়েছে মাথা ও পেট। ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "আল্লাহকে সঠিকভাবে লজ্জা করতে হলে অবশ্যই মাথা ও মাথা যা ধারণ করে এবং পেট ও পেট যা ধারণ করে, সেসবের হেফাজত করতে হবে।" এটি বর্ণিত হয়েছে *আহমাদ* ও *তিরমিযিতে*।[৩১]

মাথা ও মাথা যা ধারণ করে, এর অন্তর্ভুক্ত হলো কান, চোখ ও জিহ্বা। কোনো হারাম জিনিস শোনা, দেখা বা স্বাদ গ্রহণ করা থেকে এদের হেফাজত করতে হবে। পেট ও পেট যা ধারণ করে, তার মধ্যে রয়েছে অন্তর। হারাম জিনিসে লিপ্ত থাকতে চাওয়া থেকে অন্তরকে হেফাজত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

> **"শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর–এ প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসিত হবে।"**[৩২]

এ ছাড়া হারাম জিনিস খাওয়া থেকে পেটকে হেফাজত করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

১.৫ জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করা

হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করাও ফরয। আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দুই চোয়াল ও দুই ঊরুর মাঝে যা আছে, সেগুলোর হেফাজত যে করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এটি বর্ণিত হয়েছে *মুস্তাদরাক আল-হাকিমে*।[৩৩]

বুখারিতেও সাদ ইবনু সাহল ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

---

[৩১] আহমাদ : ৩৬৫১; তিরমিযি : ২৪৫৮; তিরমিযি বলেছেন হাদীসটি গারীব। আরনাউত বলেছেন এর ইসনাদ যঈফ। *সহীহ আত-তারগীব* : ১৭২৪-২৬৩৮-৩৩৩৭ একে হাসান লি গাইরিহি বলেছেন।

[৩২] সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৬

[৩৩] হাকিম : ৮০৫৮; তিনি একে সহীহ বলেছেন। যাহাবি তাঁর সাথে একমত। একই অর্থের একটি হাদীস রয়েছে তিরমিযি : ২৪০৯-এ। তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন। এ ছাড়া আবু হুরায়রা ﷺ থেকে ইবনে হিব্বানে (৫৭০৩) বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ যাকে তার দুই ঠোঁট ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী বস্তুর অকল্যাণ থেকে রক্ষা করেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

"দুই চোয়াল ও দুই উরুর মাঝে যা আছে, সেগুলোর হেফাজত করার ব্যাপারে যে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা জানাচ্ছি।"[৩৪]

মুসনাদু আহমাদে আবু মূসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দুই চোয়াল ও দুই উরুর মাঝে যা আছে, সেগুলো যে হেফাজত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৫]

আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে লজ্জাস্থানের হেফাজতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এর হেফাজতকারীদের প্রশংসা করেছেন,

"মুমিন পুরুষদের বলুন যেন তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"[৩৬]

"...লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী..."[৩৭]

"...যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে—শুধু তাদের স্ত্রী ও দক্ষিণ হস্ত মালিকানা (ক্রীতদাসী) ব্যতীত, কারণ সে ক্ষেত্রে তারা নিন্দা থেকে মুক্ত।"[৩৮]

বর্ণিত আছে যে, আবু ইদরীস আল-খাওলানি বলেন, "আদাম যখন জমিনে অবতরণ করেন, তখন আল্লাহ্ সর্বপ্রথম তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন লজ্জাস্থানের হেফাজত করার এবং হালাল স্থান ছাড়া অন্য কোথাও তা ব্যবহার না করার।"

---

[৩৪] *বুখারি*: ৬৪৭৪-৬৮০৭

[৩৫] আহমাদ : ১৯৫৫৯; হাকিম : ৮০৬৩; আরনাউত একে হাসান লি গাইরিহি বলেছেন।

[৩৬] সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ৩০

[৩৭] সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৫

[৩৮] সূরাহ আল-মুমিনুন, ২৩ : ৫-৬

অধ্যায় দুই
আল্লাহ্ তোমাকে হেফাজত করবেন

নবীজি ﷺ-এর কথা "তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন" এর অর্থ হলো– যে কেউ আল্লাহর দেওয়া সীমা সংরক্ষণ করে ও তাঁর অধিকারসমূহ আদায় করে, তাকে আল্লাহ হেফাজত করবেন। কারণ, যেমন কর্ম তেমন ফল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"...আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব..."[৩৯]

"আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।"[৪০]

"...তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন..."[৪১]

আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে হেফাজত করা হয় দুই রকমে :

এক. এমন জিনিসের ব্যাপারে তাকে হেফাজত করা, যা দুনিয়ায় তার উপকার করবে। যেমন : তার শরীর, সন্তান, পরিবার ও সম্পদ।

ইবনে উমার ؓ থেকে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ঘুম থেকে জাগার পর ও ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই দু'আ করা কখনোই ত্যাগ করেননি,

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এই দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাচ্ছি আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ, আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে রূপান্তর করুন নিরাপত্তায়। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হেফাজত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পেছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের উসিলায় আশ্রয় চাই আমার নিচ থেকে

---

[৩৯] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ৪০
[৪০] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৫২
[৪১] সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৭

হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে।” *আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ* ও *ইবনু মাজাহ*তে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[৪২]

দু'আটি আল্লাহর এই আয়াতের মর্মকথা :

“মানুষের সামনে ও পেছনে পাহারাদার (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।”[৪৩]

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, “তাঁরা হলেন ফেরেশতা, যারা আল্লাহর হুকুমে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর যখন নির্ধারিত বিষয় চলে আসে, তাঁরা তাকে পরিত্যাগ করেন।”[৪৪]

আলি ﷺ বলেন, “দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত থেকে ব্যক্তিকে সেইসব বিষয় থেকে রক্ষা করেন, যা তাকদিরে নির্ধারিত নয়। তারপর যখন নির্ধারিত বিষয় চলে আসে, তাঁরা তাকে ছেড়ে যান। মনে রেখো, নির্ধারিত সময় হলো সুরক্ষিত ঢালের মতো।”[৪৫]

মুজাহিদ ﷺ বলেন, “প্রতিটি মানুষের সাথেই ফেরেশতা আছেন, যারা তাকে তার জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় জিন, মানুষ ও ক্ষতিকর প্রাণী থেকে হেফাজত করেন। বান্দার কাছে এ রকম যা-ই আসে, তাকেই তাঁরা বলেন, ‘দূর হও তুমি!’ শুধু সেসব ব্যতীত, যেগুলো দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন।”[৪৬]

২.১ আল্লাহ কর্তৃক স্বাস্থ্য ও সম্পদের হেফাজত

আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে হেফাজত করার একটি ধরন হলো বান্দার স্বাস্থ্য, শক্তি, বুদ্ধি ও সম্পদ সংরক্ষণ। একজন সালাফ বলেছেন, “আলিম কখনো বার্ধক্যজনিত

---

[৪২] আহমাদ : ৪৭৫৮; আবু দাউদ : ৫০৭৪; নাসাঈ : ৫৫৩১-৫৫৩২; ইবনু মাজাহ : ৩৮৭১; ইবনু হিব্বান : ৯৬১-তে একে সহীহ বলেছেন। এ ছাড়া হাকিম : ১৯০২ একে সহীহ বলেছেন : যাহাবি একমত। আলবানি, *সহীহ আত-তারগীব* : ৬৫৯; আরনাউত ও অন্যান্য। ইবনু আল্লানের মতে ইবনু হাজার একে হাসান গারীব বলেছেন, *আল-ফুতুহাতুর রব্বানিয়্যাহ* : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৯

[৪৩] সূরাহ আর-রা'দ, ১৩ : ১১

[৪৪] তাবারি, ২০২১৬-২০২১৭; সুয়ুতি, *আদ্দুররুল মানসুর* : খণ্ড ৪, ৬১৪ পৃষ্ঠাতে একে আব্দুর রাযযাক, ফারয়াবি, ইবনুল মুনযির এবং ইবনু আবি হাতিমের সাথেও সম্পৃক্ত করেছেন।

[৪৫] তাবারি : ২০২৭৪; যখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে কিছু লোক তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে, তখন তিনি এ কথা বলেন।

[৪৬] তাবারি : ২০২৪৫

ভীমরতিতে পতিত হন না।" আরেকজন বলেছেন, "যে কেউ কুরআন মুখস্থ করে, সে দেখবে যে তার জ্ঞানবুদ্ধি বরকতময় হয়ে গেছে।"

আল্লাহর তা'আলা কুরআনে বলেন :

> **"অতঃপর তাদের করেছি নীচ থেকে নীচতর। কিন্তু তাদের নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।"**[৪৭]

এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন "নীচ থেকে নীচতর" অর্থ বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা।[৪৮]

আবুত্তাইয়্যিব আত-তাবারি ﵀ এক শতাধিক বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি খুব একটা লোপ পায়নি। একবার তিনি বড় একটি জাহাজ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামেন। এ জন্য তাঁকে তিরস্কার করা হলে তিনি বলেন, "আমরা এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যৌবনে গুনাহ থেকে হেফাজত করেছি। তাই বার্ধক্যে আমাদের জন্য আল্লাহ এগুলোকে হেফাজত করছেন।"[৪৯]

জুনাইদ ﵀ একবার এক বৃদ্ধ লোককে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন, "এই লোকটি যৌবনে আল্লাহর প্রতি দায়িত্বে অবহেলা করেছে। তাই তার বার্ধক্যে আল্লাহ তাকে অবহেলা করছেন।"

এ ছাড়া মানুষের নেক কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তার সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনিদেরও হেফাজত করেন। আল্লাহ কুরআনে বলেন :

> **"তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।"**[৫০]

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তারা তাদের পিতার নেক আমলের মাধ্যমে হেফাজত হয়েছে।[৫১]

---

[৪৭] সূরাহ আত-তিন, ৯৫ : ৫-৬

[৪৮] "আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের কাউকে অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে জ্ঞান লাভ করার পরেও আর কোনো কিছুর জ্ঞান থাকে না। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সর্বাপেক্ষা শক্তিমান।" (সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ৭০) অনুরূপ সূরাহ আল-হাজ্জ, ২২ : ৫

[৪৯] ইবনু কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৮০

[৫০] সূরাহ আল-কাহফ, ১৮ : ৮২

[৫১] ইবনু আব্বাস কর্তৃক ব্যক্ত ও ইবনুল মুবারক (*আয-যুহদ* : ৩৩২) ও তাবারি কর্তৃক উদ্ধৃত

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার নেক আমলের কারণে তার সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনিদের হেফাজত করেন। সে যে শহরে রয়েছে এবং এর আশপাশের স্থাপনাকেও আল্লাহ হেফাজত করেন। তারা সব সময়ই আল্লাহর নিরাপত্তাবেষ্টনীতে থাকবে।"[৫২]

ইবনুল মুসাইয়্যিব ﷺ তাঁর সন্তানকে বলেন, "পুত্র, আমি তোমার জন্য বেশি বেশি সালাত আদায় করি এই আশায় যে, তোমার মাধ্যমে আমাকে হেফাজত করা হবে।" তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

"তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।"[৫৩]

উমার বিন আব্দুল আযিয বলেছেন, "যে মুমিনই মৃত্যুবরণ করুক, আল্লাহ তাকে তার সন্তান ও নাতিদের মাধ্যমে হেফাজত করেন।"

ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাইল ইবনে সালামাহ ইবনে খুয়াইল ﷺ বলেন, "আমার এক বড় বোন ছিল, যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ও অচল হয়ে পড়ে। সে আমাদের চিলেকোঠার দূরতম কোনায় বসে থাকত। সেখানেই সে দশ বছরের কিছু বেশি সময় কাটায়। মাঝরাতে আমরা ঘুমে থাকা অবস্থায় কেউ একজন দরজায় কড়া নাড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?' সে উত্তর দিলো, 'কাজ্জাহ। আমি বললাম, 'আমার বোন?' সে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার বোন।' আমি দরজা খোলার পর সে দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমাদের ঘরে প্রবেশ করল। তারপর বলল, 'কেউ একজন আমার স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলল, 'আল্লাহ তোমার বাবা ইসমাইলকে তোমার দাদা সালামাহর উসিলায় হেফাজত করেছেন। তিনি তোমাকে তোমার পিতার উসিলায় হেফাজত করেছেন। অতএব, যদি তুমি চাও, তাহলে আল্লাহর কাছে দু'আ করো। যা তোমাকে আক্রান্ত করেছে, তা তোমাকে ছেড়ে যাবে। অথবা তুমি ধৈর্য ধরতে পারো, তাহলে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আবু বকর ﷺ ও উমার ﷺ-এর প্রতি তোমার বাবা ও দাদা যে ভালোবাসা পোষণ করতেন, তার কারণে আবু বকর ও উমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তোমার জন্য শাফাআত করেছেন।' আমি বললাম, 'যদি দুটির একটিই নিতে হয়, তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করে জান্নাত লাভ করাকে বেছে নিলাম। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়ালু। কোনো কিছুই তাঁর জন্য কঠিন নয়। তিনি যদি আমাকে দুটিই দিতে চান, তাহলে তিনি তা করতে সক্ষম।' তারপর আমাকে বলা হলো, 'আল্লাহ তোমাকে উভয়টিই দিলেন। তিনি তোমার পিতা ও পিতামহের প্রতি সেই ভালোবাসার কারণে সন্তুষ্ট,

---

[৫২] আবু নুয়াইম, *আল-হিলইয়াহ* : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৮; ইবনুল মুবারাক, *আয-যুহদ* : ৩৩০

[৫৩] সূরাহ আল-কাহফ, ১৮ : ৮২

যেই ভালোবাসা তারা আবু বকর ও উমারের প্রতি রাখত।'' আর আল্লাহ্ তাকে তার অসুস্থতা থেকে মুক্তি দিলেন।"

বান্দা যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্যে নিজেকে সঁপে দেয়, আল্লাহ্ তাকে নিম্নোক্ত হাদীস অনুযায়ী হেফাজত করেন। *মুসনাদু আহমাদে* হুমাইদ বিন হিলাল সূত্রে এক বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, "আমি নবীজি ﷺ-এর কাছে এলাম আর তিনি আমাকে একটি ঘর দেখিয়ে বললেন, 'এই বাড়িতে এক নারী বাস করত, যে এক মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সাথে অভিযানে যায়। সে তার মালিকানাধীন বারোটি ছাগল ও কাপড় বোনার কাঁটা ঘরে রেখে যায়। এর মধ্যে একটি ছাগল ও কাঁটা হারিয়ে যায়। সে দু'আ করে, 'হে আল্লাহ্, যে আপনার রাস্তায় বের হয়, আপনি তার হেফাজতের ওয়াদা করেছেন। আমি একটি ছাগল ও কাপড় বোনার কাঁটা হারিয়ে ফেলেছি। আমি আপনার কাছে মিনতি করছি তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।'" রাসূল ﷺ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উদ্দেশ্যে ওই নারীর করা দু'আর গভীরতা নিয়ে মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন, 'সকালে জেগে উঠে সে হারানো ছাগল ও কাঁটা ফিরে পেল এবং সেই সাথে অনুরূপ আরও পেল। যদি চাও, তাহলে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।' আমি বললাম, 'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি।'"[৫৪]

শাইবান আর-রা'ই ﷺ এক খোলা মাঠে তাঁর পশুপাল চরাতেন। জুমু'আর দিন সালাতে যাওয়ার সময় তিনি পশুগুলোর চারপাশে একটি দাগ টেনে দিয়ে যান। সালাত শেষে ফিরে তিনি সেগুলোকে ঠিক ওই জায়গাতেই সহি সালামতে দেখতে পান।[৫৫]

একজন সালাফের একটি নিক্তি ছিল, যা দিয়ে তিনি দিরহাম পরিমাপ করতেন। তিনি আযান শুনতে পেয়ে সেগুলোকে মাটিতে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় রেখেই সালাতে চলে গেলেন। ফিরে এসে তিনি পড়ে থাকা টাকাপয়সা গুছিয়ে নিলেন এবং এর মধ্যে একটি পয়সাও হারিয়ে যায়নি।

২.২ ক্ষতি থেকে আল্লাহ কর্তৃক হেফাজত

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে হেফাজত করার আরেকটি প্রকার হলো দুনিয়ার জীবনে তার ক্ষতি করতে চাওয়া প্রতিটি জিন ও মানুষ থেকে তাকে হেফাজত করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

---

[৫৪] আহমাদ : ২০৬৬৪; হাইসামি : খণ্ড ৫, ২৭৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, বর্ণনাকারীগণ সহীহাইনের।
[৫৫] আবু নুয়াইম : খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩১৭

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য কোনো না-কোনো পথ বের করে দেবেন আর তাকে (এমন উৎস) থেকে রিযক দেবেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না।"[৫৬]

এর ব্যাখ্যায় আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "তিনি তার দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা দূর করতে যথেষ্ট হবেন।"[৫৭] রাবি ইবনু খুসাইম বলেন, "মানুষের উপর যত রকম বোঝা চাপতে পারে, তিনি তাকে সেসব থেকে বের হওয়ার পথ করে দেবেন।"[৫৮]

মুয়াওয়িয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উদ্দেশ্যে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা লেখেন,

"আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করেন, তাহলে লোকদের বিরুদ্ধে তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর যদি আপনি মানুষকে ভয় করেন, তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনাকে জয়ী করতে পারবে না।"[৫৯]

হাকাম ইবনু আমর আল-গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একজন খলিফা একটি চিঠি লিখেন, যেখানে আল্লাহর কিতাববিরোধী কিছু কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি জবাবে লেখেন,

"আমি আল্লাহর কিতাবে দেখলাম যে, এটি আমীরুল মুমিনীনের চিঠির উপর প্রাধান্য পাবে। আসমান ও জমিন যদি একটি দলা করে মিশিয়ে ফেলা হয় আর বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ভয় রাখে, তাহলে আল্লাহ তাকে সেখান থেকেও বের হওয়ার পথ করে দেবেন। সালাম।"

একজন সালাফ কাব্যে লিখেছেন :

তাকওয়ার দ্বারাই আসে বিপদমুক্তি,
আসে বিজয়, বাড়ে আশার শক্তি।
তাকওয়া থাকলে বের করেই দেবেন পথ,
বান্দার প্রতি এটিই আল্লাহর শপথ।

একজন সালাফ তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে চিঠিতে লিখেছেন, "...পর সমাচার এই যে, যার তাকওয়া রয়েছে, সে নিজেকে হেফাজত করল। যে তাকওয়াকে অবহেলা

---

[৫৬] সূরাহ আত-তলাক, ৬৫ : ২

[৫৭] *আদ্দুররুল মানসুরে* সুয়ুতি একে ইবনু আবি হাতিমের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

[৫৮] তাবারি

[৫৯] ইবনু আবি শাইবাহ : খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৬১

করল, সে নিজেকেই অবহেলা করল আর তাকে আল্লাহর কোনো প্রয়োজনই নেই।"

২.৩ জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে আল্লাহ কর্তৃক হেফাজত

যারা আল্লাহকে হেফাজত করে, আল্লাহ তাদের আরেকটি বিস্ময়কর উপায়ে হেফাজত করেন। যেসব জন্তু-জানোয়ার সাধারণত ক্ষতিকর, আল্লাহ সেসবকে তাদের সুরক্ষা ও সাহায্যের কাজে নিয়োগ করে দেন। এমনটিই ঘটেছিল নবীজি ﷺ-এর আযাদকৃত দাস সাফিনা -এর সাথে। তাঁর নৌকা ডুবে যায় আর তিনি এক দ্বীপে ভেসে আসেন। সেখানে তিনি এক সিংহ দেখে বলেন, "এই আবুল হারিস, আমি সাফিনাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত দাস।" সিংহটি তাঁর সাথে সাথে হাঁটল এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তারপর বিদায় জানানোর মতো করে গরগর শব্দ করে চলে গেল।[৬০]

আবু ইবরাহীম আস-সাইহ এক মঠের কাছাকাছি জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "আমি যদি মঠটির দরজাটা পর্যন্তও যেতে পারতাম, তাহলে সন্ন্যাসীরা বেরিয়ে এসে আমার সেবা করতে পারত।" এক সিংহ বেরিয়ে এসে তাঁকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে মঠের দরজায় রেখে আসে। প্রায় চার শ জন সন্ন্যাসী তাঁকে দেখে বেরিয়ে আসেন ও তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করেন।[৬১]

একবার ইবরাহীম বিন আদহাম একটি বাগানে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর পাশেই একটি সরীসৃপ ছিল, যার মুখে ড্যাফোডিলের একটি চক্র ছিল। তিনি জেগে ওঠা পর্যন্ত এটি তাঁকে পাহারা দিলো।

অতএব বোঝা গেল, যে কেউ আল্লাহকে হেফাজত করে, আল্লাহ তাকে হিংস্র প্রাণী থেকে হেফাজত করেন। উল্টো সেগুলোকে সেই বান্দার উপকারে লাগিয়ে দেন। আর যারা আল্লাহকে অবহেলা করে, আল্লাহও তাকে অবহেলা করেন। এমনকি যেসব জিনিস থেকে মানুষ উপকার আশা করে, সেগুলোও তার ক্ষতি করে বসে। যেমন পরিবারের সবচেয়ে কাছের লোক বা অন্য কোনো প্রিয় মানুষ।

[৬০] আবু নুয়াইম : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৯; তাবারানি, *আল-কাবির* : ৬৪৩২; হাকিম : ৬৫৫০; তিনি একে সহীহ বলেছেন, যাহাবি একমত।
[৬১] যাহাবি, *সিয়ার* : খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২২৮-২২৯; তিনি একে মুনকার বলেছেন।

একজন সালাফ বলেছেন, "আমি যখন আল্লাহর অবাধ্যতা করি, তাহলে আমার চাকর ও পোষা গাধার আচার-আচরণেও এর প্রভাব দেখতে পাই।"[৬২] অর্থাৎ, তাঁর চাকর অগোছালো কাজ করে ও তাঁর অবাধ্য হয় এবং তাঁর গাধা তাঁকে বহন করতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে।

সকল কল্যাণ রয়েছে আল্লাহকে মানা ও তাঁর দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে। আর সব অকল্যাণ রয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতা করা ও তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, "যে কেউ তার মনিবের দুয়ার পরিত্যাগ করে, সে কখনোই জমিনে দৃঢ়ভাবে পা রাখতে পারে না।"

তাঁদের একজন এই কবিতা লিখেছেন :

আল্লাহর কসম! যতবার তোমার দুয়ারে এসেছি,
দূরের পথ নিজেকে দিয়েছে সংক্ষেপ করে।
যখন তোমার দুয়ার ত্যাগের বাসনা করেছি,
কাপড়েতে পা বেঁধে জমিনে গিয়েছি পড়ে।
আল্লাহর দোহাই! ক্ষমা করো, ভুলে যাও, পেতে দাও,
আমার অবস্থা তোমার নিজের চোখ দিয়ে দেখে নাও।

আল্লাহর হেফাজতের মহত্তম রূপ হলো বান্দাকে তার দ্বীনের ব্যাপারে হেফাজত করা।

২.৪ আল্লাহ কর্তৃক সংশয় ও লোভ-লালসা থেকে হেফাজত

বান্দার জীবদ্দশায় আল্লাহ তাকে সব রকমের সংশয়, পথভ্রষ্টকারী বিদআত ও অবৈধ লোভলালসা থেকে হেফাজত করেন। মৃত্যুর সময়ও আল্লাহ তার দ্বীনকে এমনভাবে হেফাজত করেন যে, সে ইসলামের পথে থাকা অবস্থায় মারা যায়।

হাকাম ইবনু আবান থেকে বর্ণিত আবু মাকি বলেন,

> "মানুষের মৃত্যু এলে ফেরেশতাকে বলা হয় 'তার মাথা শুঁকো।' ফেরেশতা বলেন, 'আমি কুরআনের সুগন্ধ পাচ্ছি।' বলা হয়, 'তার অন্তর শুঁকো।'

---

[৬২] আবু নুয়াইম : খণ্ড ৮, ১০৯ পৃষ্ঠায় ফুদাইল ইবনু ইয়াদ থেকে উদ্ধৃত।

ফেরেশতা বলেন, 'আমি সিয়ামের সুগন্ধ পাচ্ছি।' বলা হয়, 'তার পা শুঁকো।' তিনি বলেন, 'আমি তাহাজ্জুদের সুগন্ধ পাচ্ছি।' সে নিজের নফসকে হেফাজত করেছে, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে হেফাজত করেছেন।" ইবনু আবিদ্দুনিয়া এটি বর্ণনা করেছেন।[৬৩]

বুখারি ও *মুসলিমে* বর্ণিত আছে যে নবীজি ﷺ আল-বারা ইবনু আযি ﷺ-কে ঘুমানোর সময় এই দু'আ পড়তে শিখিয়েছেন,

"হে আমার রব, যদি আপনি আমার প্রাণ আটকে রাখেন, তবে আপনি তাকে দয়া করুন। আর যদি আপনি তা ফেরত পাঠিয়ে দেন, তাহলে আপনি তার হেফাজত করুন, যেভাবে আপনি আপনার সৎকর্মশীল বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন।"[৬৪]

সহীহ ইবনে হিব্বানে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজি ﷺ দু'আ করতে শিখিয়েছেন,

"হে আল্লাহ, দাঁড়ানো অবস্থায় আমাকে ইসলামের মাধ্যমে হেফাজত করুন, বসা অবস্থায় আমাকে ইসলামের মাধ্যমে হেফাজত করুন এবং শোয়া অবস্থায় আমাকে ইসলামের মাধ্যমে হেফাজত করুন। আমার ব্যাপারে হিংসুক শত্রুর দু'আর জবাব দেবেন না।"[৬৫]

---

[৬৩] আবু নুয়াইম : খণ্ড ৮, ১০৯ পৃষ্ঠায় ফুদাইল ইবনু ইয়াদের উক্তি হিসেবেও এটি উল্লেখিত হয়েছে

[৬৪] শব্দগুলো *বুখারি* : ৬৩২০-৭৩৯৩ এবং *মুসলিম* : ২৭১৪ এর যা আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। আল-বারার হাদীসটি রয়েছে *বুখারি* : ৬৩১১-৬৩৩৩-৭৪৮৮ এবং *মুসলিম* : ২৭১০। কথাগুলো হলো, "ঘুমাতে যাবার সময় সালাতের ওযুর মতো ওযু করে নেবে, ডান কাত হয়ে শুবে এবং বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি আমার মুখ আপনার দিকে ফেরালাম...'"

[৬৫] ইবনু হিব্বান : ৯৩৪, যঈফ ইসনাদে; হাকিম : ১৯২৪-এ এর সমর্থনে ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। "হে আল্লাহ, আমাকে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় ইসলামের দ্বারা হেফাজত করুন। আমার কোনো শত্রু বা হিংসুককে (আমার উপর আপতিত বিপদের কারণে) আনন্দিত হতে দেবেন না। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সেই সকল কল্যাণ চাই, যার ভান্ডার আপনার হাতে। আর আমি আপনার কাছে সেই সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই, যার ভান্ডার আপনার হাতে।" আল-জামিউস সগীর : ১৪৮৬-তে সুয়ুতি একে সহীহ বলেছেন। আস-সহীহাহ : ১৫৪০-এ আলবানি একে হাসান বলেছেন, কারণ উভয় হাদীস একে অপরের সমর্থনকারী

রাসূল ﷺ যখন কোনো মুসাফিরকে বিদায় জানাতেন, তখন বলতেন, "আমি তোমার দ্বীন, বিশ্বাস ও চূড়ান্ত আমল আল্লাহর দায়িত্বে সমর্পিত করছি।"[৬৬] আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন, "আল্লাহ যখন কোনো কিছু নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন, তখন তিনি তা হেফাজত করেন।" *নাসাঈ* ও অন্যান্য কিতাবে তা বর্ণিত হয়েছে।[৬৭]

তাবারানির বর্ণিত একটি হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন,

> "যেভাবে সালাত আদায় করা উচিত, বান্দা যখন সেভাবে সালাত আদায় করে, তখন সেই সালাত সূর্যের মতো আলোকিত হয়ে আল্লাহর কাছে উঠে যায় আর মুসল্লীকে বলে, 'আল্লাহ তোমাকে সেভাবে হেফাজত করুন, যেভাবে তুমি আমার হেফাজত করলে।' সে যদি অলসতা ও অবহেলার সাথে তা আদায় করে, তাহলে পুরনো কাপড় প্যাঁচানোর মতো করে প্যাঁচিয়ে তা মুসল্লীর মুখে ছুড়ে মেরে বলা হবে, 'তুমি যেভাবে আমাকে নষ্ট করলে, আল্লাহ তোমাকে সেভাবে নষ্ট করুন।'"[৬৮]

---

[৬৬] তিরমিযি : ৩৪৪২-৩৪৪৩; আবু দাউদ : ২৬০০; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ : ৫২৪; ইবনু মাজাহ : ২৮২৬, ইবনু উমার থেকে বর্ণিত। তিরমিযি একে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। একে সহীহ ঘোষণা করেছেন ইবনু হিব্বান : ২৬৯৩ এবং হাকিম : ২৪৭৫, যাহাবি একমত। ইবনু আসাকির, *মুজামুশ শুয়ুখ* : খণ্ড ২, ৭৮০ পৃষ্ঠাতে একে হাসান বলেছেন। ইবনু আল্লানের মতে ইবনু হাজারও একে হাসান বলেছেন। একই শব্দে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ : ২৬০১, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ থেকে; নববী, *রিয়াদুস সলিহীন* : ২৯৪ এবং *আল-আযকার* : ২৭৯ পৃষ্ঠাতে এর ইসনাদকে সহীহ বলেছেন। আলবানি, *আস-সহীহাহ* : ১৫-১৬০৫ এ একই কথা বলেছেন।

[৬৭] নাসাঈ, *আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ* : ৫০৬, ৫০৯, ৫১৭; ইবনু হিব্বান : ২৩৭৬ (মাওয়ারিদ); বায়হাকি, *আস-সুনানুল কুবরা* : খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৭৩, ইবনু উমার থেকে হাসান ইসনাদে বর্ণিত।

[৬৮] তাবারানি, *আল-আসওয়াত* : ৩০৯৫, আনাস থেকে বর্ণিত। ইরাকি, *আল-মুগনি* : ৩৮২-তে বলেছেন এর ইসনাদ যঈফ। তিনি আরও বলেন, উবাদা ইবনুস সামিত থেকে যঈফ ইসনাদে তায়ালিসিও এটি বর্ণনা করেছেন। হায়সামি : খণ্ড ১, ৩০২ পৃষ্ঠায় আনাসের এই হাদীসের ব্যাপারে বলেন, "এর ইসনাদে উববাদ ইবনু কাসির আছেন, যার দুর্বলতার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। আলবানি, *যঈফ আত-তিরমিযি* : ২২১-২৮০ তে একে যঈফ জিদ্দান বলেছেন। উবাদার হাদীসের ব্যাপারে হায়সামি : খণ্ড ২, ১২২ পৃষ্ঠায় বলেন যে, এতে আল-আহওয়াস ইবনু হাকিম নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, যাকে ইবনুল মাদানি এবং আল-ইজলি সিকাহ বলেছেন এবং অন্য আরেক দল যঈফ বলেছেন।

উমার বিন খাত্তাব ﷺ তাঁর খুতবায় বলতেন, "হে আল্লাহ, আপনার নিরাপত্তার মাধ্যমে আমাদের হেফাজত করুন। আর আমাদের আপনার হুকুমের উপর অটল রাখুন।"

একজন সালাফকে একবার এক ব্যক্তি বলল, "আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন।" তিনি জবাবে বললেন, "আমার ভাই, এই দু'আ কোরো না যে, সেই ব্যক্তি হেফাজতে থাকুক। বরং এই দু'আ করো যাতে সেই ব্যক্তির ঈমান হেফাজতে থাকে।" তাঁর এ কথার অর্থ হলো দ্বীনের হেফাজতের জন্য দু'আ করাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কারণ, পার্থিব হেফাজতে তো পাপাচারী ও নেককার উভয়ই থাকতে পারে। কিন্তু শুধু মুমিন বান্দাকেই আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে হেফাজত করেন। তার দ্বীন ও এর দূষয়িতা যেকোনো বস্তুর মাঝে আল্লাহ বাধা হয়ে যান। এই বাধা তিনি নানা রকম উপায়ে দিয়ে থাকেন। কিছু উপায় বান্দা বুঝে উঠতেও পারে না, আর কিছু উপায়কে তো বাহ্যিকভাবে দেখে সে ঘৃণাই করতে শুরু করে।

ইউসুফ ﷺ-কে আল্লাহ এভাবেই বাঁচিয়েছেন,

> **"এমনটি ঘটেছে যেন আমি তাকে অসৎ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরিয়ে রাখি। সে ছিল আমার বিশুদ্ধ-হৃদয় বান্দাদের একজন।"[৬৯]**

২.৫ সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক হেফাজত

যে কেউ আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ, আল্লাহ তাকে অকল্যাণ ও অশ্লীলতা থেকে হেফাজত করেন। তিনি তাকে এমন সব মাধ্যমে রক্ষা করবেন, যার ব্যাপারে সে জানতেও পারে না। তিনি বান্দা ও গুনাহের পথের মাঝে বাধা হয়ে ওঠেন। মারুফ আল-কারখি ﷺ একবার একদল যুবককে ফিতনার সময় যুদ্ধে বের হবার প্রস্তুতি নিতে দেখলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ, তাদের হেফাজত করুন।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি ওদের জন্য কেন দু'আ করছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "তিনি (আল্লাহ) যদি তাদের রক্ষা করতেন, তাহলে তারা যে উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে সে উদ্দেশ্যে বের হতো না।"

উমার ﷺ একবার এক ব্যক্তিকে দু'আ করতে শুনলেন, "হে আল্লাহ, আপনি বান্দা ও বান্দার অন্তরের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ান। অতএব, আপনি আপনার

---

[৬৯] সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ২৪

অবাধ্যতা ও আমার মাঝে বাধা হয়ে যান।” উমার ﷺ তা শুনে খুশি হলেন এবং সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করলেন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন :

> **“জেনে রেখো, মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আল্লাহ প্রতিবন্ধক হয়ে যান...”[৭০]**

এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, “তিনি মুমিন ও গুনাহের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান, যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারত।”[৭১]

অতীতের এক ব্যক্তি হাজ্জ করতে যান। মক্কায় একদল লোকের সাথে ঘুমানোর সময় হঠাৎ তাঁর একটি গুনাহ করতে ইচ্ছে হয়। তিনি একটি কণ্ঠ শুনতে পেলেন, “দুর্ভাগ্য তোমার! তুমি কি হাজ্জ করছ না?” ফলে আল্লাহ তাঁকে গুনাহ বাস্তবায়ন করা থেকে হেফাজত করলেন।

এক ব্যক্তি একদল লোকের সাথে বেরিয়েছিলেন একটি নির্দিষ্ট গুনাহ করার উদ্দেশ্যে। তিনি যখন কাজটি করতে যাবেন তখন একটি কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল,

> **“প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।”[৭২]**

ফলে তিনি সে গুনাহ করা থেকে বিরত হলেন।

এক ব্যক্তি ঘন গাছপালার ভেতর ঢুকে ভাবলেন, “আমি এখানে গোপনে গুনাহ করতে পারি। কে দেখবে আমাকে?” তিনি তখন গাছপালার মাঝে একটি কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হতে শুনলেন, যা এই আয়াত তিলাওয়াত করছিল :

> **“যিনি সৃষ্টি করলেন, তিনিই কি জানেন না? তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, ওয়াকিফহাল।”[৭৩]**

আরেক ব্যক্তি গুনাহ করার ইচ্ছা করে তা সম্পাদন করতে গেলেন। যেতে যেতে তিনি এক বক্তার পাশ দিয়ে গেলেন, যে গল্প বর্ণনা করছিল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন সে বলছে, “ওহে যারা পাপ করতে চাও! তুমি কি জানো না যে

---

[৭০] সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ২৪

[৭১] তাবারি : ১৫৮৮০-১৫৮৮১; হাকিম : ৩২৬৫-এ একে সহীহ বলেছেন, যাহাবি একমত।

[৭২] সূরাহ আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৩৮

[৭৩] সূরাহ আল-মুলক, ৬৭ : ১৪

কামনার স্রষ্টা তোমার ইচ্ছের ব্যাপারে অবগত?" এটি শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে তাওবাহ করে নিলেন।

এক নেককার বাদশাহ তাঁর এক সুন্দরী প্রজার প্রেমে পড়ে গেলেন। তিনি নিজের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন এবং রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইলেন। সে রাতেই সেই প্রজা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিন দিন পর মারা যান।

২.৬ উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক হেফাজত

গুনাহ করার সঙ্গী হিসেবে পেতে চাওয়া ব্যক্তিদের কাছে উপদেশ শুনে অনেকেই হেফাজত হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে তিন ব্যক্তি একটি গুহায় ঢোকার পর তার মুখ পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকে তখন নিজ নিজ একটি নেক আমলের উসিলায় আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। এর মধ্যে এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে তিনি এক নারীর সাথে যিনা করতে উদ্যত হলে সেই নারী বলেন, "আল্লাহকে ভয় করুন। যথাযথ অধিকার ছাড়া পর্দা ছেদ করবেন না।" তা শুনে তিনি গুনাহ থেকে বিরত হন।[৭৪]

এর আরেকটি উদাহরণ হলো কিফল নামে বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি, যে খুব ঘন ঘন গুনাহে লিপ্ত হতেন। তিনি এক নারীর সাথে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে ষাট দিনার দিয়ে তার সাথে যিনা করতে উদ্যত হন। নারীটি প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আমি কি তোমাকে জোর করছি নাকি?" তিনি জবাব দেন, "না। কিন্তু আমি আগে কখনো এই কাজ করিনি আর কেবল অভাবের তাড়নায়ই এখন এমনটা করছি।" কিফল বললেন, "তুমি আল্লাহকে ভয় করো। আমারও কি উচিত নয় আল্লাহকে ভয় করা?" তিনি উঠে চলে যান। উপহার হিসেবে তাঁর অর্থ নারীটির জন্য রেখে যান। তিনি তারপর বলেন, "আল্লাহর কসম! কিফল আর কখনোই আল্লাহকে অমান্য করবে না।" তিনি সে রাতেই মারা যান। পরদিন সকালে তাঁর দরজায় লেখা দেখতে পাওয়া যায়, "আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করে

[৭৪] *বুখারি*: ২২১৫-২২৭২-২৩৩৩-৩৪৬৫-৫৯৭৪ এবং মুসলিম : ২৭৪৩; ইবনু উমার থেকে বর্ণিত।

দিয়েছেন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইবনু উমার ﷺ-এর সূত্রে *আহমাদ* ও *তিরমিযিতে* এটি বর্ণিত হয়েছে।[৭৫]

এক ব্যক্তি এক নারীকে প্রলুব্ধ করে দরজা আটকাতে আদেশ দেন। নারীটি দরজা আটকে বললেন, "একটি দরজা খোলা রয়ে গেছে।" লোকটি বললেন, "কোন সে দরজা?" নারীটি জবাব দিলেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও আমাদের মধ্যকার দরজা।" তা শুনে লোকটি গুনাহ থেকে বিরত হলেন।

আরেক ব্যক্তি এক বেদুঈনকে প্ররোচিত করে বলেছিল,

> "নক্ষত্র ছাড়া আর কী আছে, যা আমাদের দেখতে পাবে?" বেদুঈন নারীটি বললেন, "কেন! যিনি নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, তিনি।"[৭৬]

এ সবগুলোই হলো আল্লাহর সাহায্য এবং বান্দা ও গুনাহের মাঝে তাঁর প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠার উদাহরণ। পাপাচারীদের কথা বলে আল-হাসান ﷺ বলেন, "তাঁর (আল্লাহর) কাছে তাদের মূল্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফলে তারা তাঁর অবাধ্য হলো। তারা যদি তাঁর কাছে মান-সম্মানের অবস্থান ধরে রাখতে পারত, তাহলে তিনি তাদের হেফাজত করতেন।" বিশর ﷺ বলেন, "সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি কখনোই আল্লাহর অবাধ্যতায় লেগে থাকতে পারে না। আর না কোনো সুবিবেচক ব্যক্তি আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে পারে।"

২.৭ বান্দার জন্য আল্লাহ কর্তৃক সবচেয়ে উত্তম বিষয় নির্ধারণ

বান্দার দ্বীনকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহর আরেকটি পদ্ধতি হলো বান্দার দুনিয়াবি কামনা ব্যর্থ করে দেওয়া। বান্দা হয়তো নেতৃত্ব বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো কোনো দুনিয়াবি জিনিসের পেছনে ছুটছে। কিন্তু এটা তার দ্বীনের জন্য কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ তাকে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ করে দেন। বান্দা এর পেছনে আল্লাহর হিকমাহ বুঝতে না পেরে দুঃখিত হয়ে যায়।

---

[৭৫] আহমাদ : ৪৭৪৭ এবং তিরমিযি : ২৪৯৬; তিরমিযি একে হাসান বলেছেন। কিন্তু *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : খণ্ড ১, ২২৬ পৃষ্ঠায় ইবনু কাসির বলেছেন, "এটি শায হাদীস এবং এর ইসনাদ খুবই ত্রুটিপূর্ণ"। আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ৪০৮৩ এবং আরনাউত ও অন্যান্যরা একে যঈফ বলেছেন।

[৭৬] ইবনুল জাওযি, *যাম্মুল হাওয়া* : ২৭২ পৃষ্ঠা

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন,

> "বান্দা হয়তো ব্যবসায় বা নেতৃত্বের জন্য তোড়জোড় করে এই আশায় যে, তা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তাকে দেখে ফেরেশতাদের আদেশ দেন, 'তাকে এ থেকে বিরত রাখো। কারণ, আমি যদি তার জন্য এটির ইচ্ছা করতাম, তাহলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতাম।' ফলে আল্লাহ্ তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখবেন। বান্দা রাগে-দুঃখে বলতে থাকবে, 'অমুক আমাকে হারিয়ে দিলো! তমুক আমাকে ছাড়িয়ে গেল!' অথচ এ সবই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়া।"

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, বান্দা হয়তো কোনো নেক আমল করতে তৎপরতা চালাচ্ছে, কিন্তু তা তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নয়। ফলে আল্লাহ্ তার ও তার আমলের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান আর বান্দা সেটা টেরও পায় না। *তাবারানি*তে আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

> "আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, 'আমার বান্দাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের ঈমান কেবল দারিদ্র্যের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। আমি যদি তাকে প্রাচুর্য দিতাম, তার ঈমান হ্রাস পেত। আমার বান্দাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের ঈমান কেবল প্রাচুর্যের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। আমি যদি তাকে দারিদ্র্য দিতাম, তার ঈমান হ্রাস পেত। আমার বান্দাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের ঈমান কেবল সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। আমি যদি তাকে অসুস্থতা দিতাম, তার ঈমান হ্রাস পেত। আমার বান্দাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের ঈমান কেবল অসুস্থতার মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। আমি যদি তাকে সুস্বাস্থ্য দিতাম, তার ঈমান হ্রাস পেত। আমার বান্দাদের মাঝে অনেকে কোনো একটি ইবাদাত করতে চায়, কিন্তু আমি তাদের তা থেকে বিরত রাখি যাতে তারা অহংকারে পতিত না হয়। বান্দাদের অন্তরে কী আছে, তার ব্যাপারে আমার জ্ঞানের ভিত্তিতে আমি তাদের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করি। আমি সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।'"[৭৭]

---

[৭৭] ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-আওলিয়া* : পৃষ্ঠা ১০০; আবু নুয়াইম : খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩১৮; বায়হাকি, *আল-আসমা ওয়াসসিফাত* : ১৫০ পৃষ্ঠা। আবু নুয়াইম হাদীসটিকে গারীব বলেছেন এবং *জামিউল উলুম* : খণ্ড ২, ৩৩৩ পৃষ্ঠায় ইবনু রজব বলেছেন, "এতে আল-খুশানি ও সাদাকাহ রয়েছেন। উভয় বর্ণনাকারীই যঈফ, এবং আরেক বর্ণনাকারী হিশাম অপরিচিত।" আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ১৭৭৫-এ একে যঈফ জিদ্দান বলেছেন।

অতীতের এক ব্যক্তি খুব বেশি বেশি শাহাদাতের জন্য দু'আ করত। একটি কণ্ঠ ডেকে বলল, "তুমি যদি কোনো সামরিক অভিযানে বের হও, তুমি বন্দী হবে এবং বন্দী অবস্থায় তুমি খ্রিষ্টান হয়ে যাবে। অতএব, এর দু'আ করা বন্ধ করো।"[৭৮]

অতএব সারসংক্ষেপ হলো যে আল্লাহর সীমাসমূহ সংরক্ষণ করে এবং তাঁর অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তার দ্বীনি ও দুনিয়াবি বিষয়াদি ঠিক রাখার দায়িত্ব নেবেন।

২.৮ আল্লাহ হলেন মুমিনদের হেফাজতকারী

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন যে, তিনি হলেন মুমিনদের হেফাজতকারী। তিনি সৎকর্মশীলদের সুরক্ষা দেন। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো, দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিনের জন্য যা উপকারী, তিনি তা হেফাজত করেন। আর তিনি মুমিনদের অন্য কারও হাতে ছেড়ে যাবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

> **"আল্লাহ হলেন মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন।"[৭৯]**

> **"এর কারণ এই যে, আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক; আর কাফিরদের কোনো অভিভাবক নেই।"[৮০]**

---

[৭৮] সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ ﷺ থেকে বর্ণিত রাসূলাল্লাহ ﷺ ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সত্য নিয়তে আল্লাহর কাছে শাহাদত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।" (মুসলিম-১৯০৯,তিরমিযি-১৬৫৩,নাসায়ী-৩১৬২,আবু দাউদ-১৫২০)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সত্যচিত্তে শাহাদাত কামনা করা মুস্তাহাব"! (সূত্র- শরহে সহিহিল মুসলিমঃ ৪/৭৪)

এক হাদীসে এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ এই বলে দু'আ করতেন,

قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صلى الله عليه وسلم

"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত লাভের তাওফীক দান কর এবং আমার মৃত্যু তোমার রাসূলের শহরে প্রদান কর।" (সহিহ বুখারী- ১৮৯০)

ইবনু রজবের উল্লেখিত কথাটির সাথে এই বর্ণনাগুলোর বাহ্যিক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে তার সমাধান এ হতে পারে যে, লোকটির জিহাদ ভীতি ছিলো। কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। কিংবা মানসিকভাবে সে খুবই দুর্বল! এতে সে ফিতনায় পড়ে কিংবা পরীক্ষায় পতিত হয়ে দ্বীন ত্যাগ করার ঝুঁকি ছিলো। আল্লাহ সর্বাধিক ভালো জানেন।– শর'ঈ সম্পাদক

[৭৯] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৫৭

[৮০] সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১১

"যে কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"[৮১]

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?"[৮২]

যে কেউ আল্লাহর হকসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে, দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য কল্যাণকর সকল বিষয় সংঘটনের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন। যে কেউ চায় আল্লাহ তার হেফাজত করুন এবং তার সকল বিষয়ের দেখাশোনা করুন, সে যেন প্রথমে তার নিজের উপর আল্লাহর অধিকারসমূহের হেফাজত করে। যে কেউ চায় কোনো অপছন্দনীয় বিষয় তাকে স্পর্শ না করুক, সে যেন আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এড়িয়ে চলে।

একজন সালাফ এক মজলিস থেকে আরেক মজলিসে যেতেন আর বলতে থাকতেন, "যে কেউ চায় আল্লাহ তার ভালো অবস্থার হেফাজত করুন, সে যেন তাকওয়া অবলম্বন করে।"

দুনিয়াবিমুখ সাধক আল-উমারি ﵀-এর কাছে কেউ উপদেশ চাইলে তিনি বলতেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে নিজের প্রতি যেমন পেতে চাও, আল্লাহর সাথেও ঠিক তেমনটাই হও।"

সালিহ ইবনু আব্দুল কারিম ﵀ বলেছেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'আমার ক্ষমতা ও জালালের কসম! আমার আনুগত্যে লেগে থাকার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে অন্তরের দিকেই আমি তাকাই, সেটিকেই সকল অবস্থায় রক্ষা করা ও দৃঢ় রাখার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি।'"

পূর্বেকার এক আসমানি কিতাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি কি আমাকে বলবে না কিসে তোমার হাসির উদ্রেক করে? হে আদমসন্তান, আমার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করো, তারপর যেখানে খুশি সেখানে ঘুমিয়ে পড়ো।'"

এর অর্থ হলো সঠিকভাবে তাকওয়া অবলম্বন করতে পারলে আর কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। আপনার জন্য কোন বিষয়টি উত্তম, সর্বজ্ঞ আল্লাহ আপনাকে সেদিকে পরিচালিত করবেনই।

জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে কেউ আল্লাহর কাছে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চায়, সে যেন নিজের দিকে তাকায় এবং তার

---

[৮১] সূরাহ আত-তলাক, ৬৫ : ৩

[৮২] সূরাহ আয-যুমার, ৩৯ : ৩৬

কাছে আল্লাহর মর্যাদা কেমন, তা দেখে। যে আল্লাহকে যেমন মর্যাদা দেয়, আল্লাহ তাকে তেমনই মর্যাদা দেন।"[৮৩]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কতটা হেফাজত করবেন, তা নির্ভর করে বান্দা আল্লাহর হক ও তাঁর দেওয়া সীমা-পরিসীমার কতটা হেফাজত করে সেটার উপর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা, তাঁকে জানা, তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর ইবাদাত করা যার লক্ষ্য, সে খেয়াল করবে যে, আল্লাহও তার সাথে অনুরূপ যথোচিত আচরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

> **"আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।"[৮৪]**
>
> **"আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো, আমি তোমাদের প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ করব।"[৮৫]**

তার উপর আল্লাহ হলেন দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু। তিনি একটি নেক আমলের দশ বা তার চেয়ে বেশি গুণ প্রতিদান দেন। যে কেউ আল্লাহর দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আল্লাহ তার দিকে এক হাত অগ্রসর হন। যে আল্লাহর দিকে হেঁটে আসে, আল্লাহ তার দিকে দৌড়ে আসেন।[৮৬]

মানুষকে যা কিছুই দেওয়া হয়, তা তার নিজের পক্ষ থেকেই। আর যে বিপদই তার উপর আপতিত হয়, এর কারণ হলো আল্লাহর অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে তার কোনো না-কোনো গাফলতির ফল। আলি ﷺ বলেন, "বান্দার কর্তব্য হলো তার

---

[৮৩] আবু ইয়ালা : ১৮৬৫-২১৩৮; তাবারানি, *আল-আসওয়াত* : ২৫০১; হাকিম : ১৮২০ এ একে সহীহ বলেছেন। কিন্তু যাহাবি বলেন, "এতে উমার নামে এক যঈফ বর্ণনাকারী রয়েছেন"। হায়সামি : খণ্ড ১০, ৭৭ পৃষ্ঠায় বলেন, "এর বর্ণনাসূত্রে উমার ইবনু আব্দুল্লাহ রয়েছেন, যিনি গুফরাহর আযাদকৃত দাস। তাঁকে একাধিক আলেম সিকাহ বলেছেন। একদল বলেছেন যঈফ। বাকি বর্ণনাকারীরা সহীহাইনের বর্ণনাকারী। আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ৫৪২৭-৬২০৫ এ একে যঈফ বলেছেন।

[৮৪] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৫২

[৮৫] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ৪০

[৮৬] *বুখারি* : ৭৪০৫ এবং *মুসলিম* : ২৬৮৭-২৭৪৩ এ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, "যে কেউ আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।" আহমাদ : ২১৩৭৪-এ আবু যার এর বর্ণনায় আরও আছে, "এবং আল্লাহ আরও মহান, এবং আল্লাহ আরও মহান"। হায়সামি : খণ্ড ১০, ১৯৭ পৃষ্ঠায় একে হাসান বলেছেন

আশা কেবল তার রবের প্রতিই রাখা, তাহলে নিজের গুনাহ ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়েই তার ভীত হওয়ার কারণ নেই।"

একজন সালাফ বলেছেন, "যে কেউ পরিশুদ্ধ করে, তাকে পরিশুদ্ধ করা হয়। আর যে দূষিত করে, তার সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হবে।"

মাসরুক ﵀ বলেন, "যার অন্তরের গতিবিধি অত্যন্ত সচেতনভাবে আল্লাহর প্রতি সম্মান রাখে, আল্লাহ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধি হেফাজত করবেন।"

এ ব্যাপারে আরও অনেক অনেক কথা বলা যায়। তবে এ পর্যন্ত আমরা যতটুকু বললাম ততটুকুই যথেষ্ট। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর।

অধ্যায় তিন

আল্লাহ তোমার সাথে আছেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে।" আরেক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার আগে পাবে।" এর অর্থ হলো, যে কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা হেফাজত করে এবং তাঁর অধিকারসমূহ যত্নসহকারে পালন করে, সে সকল ব্যাপারে আল্লাহকে তার সাথে পাবে। আল্লাহ তাকে বেষ্টন করে রাখবেন, সাহায্য করবেন, সংরক্ষণ করবেন, অবলম্বন দান করবেন, তার পা দৃঢ় রাখবেন, এবং আসমানি সাহায্য প্রদান করবেন। তিনি "প্রত্যেক প্রাণীর উপার্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখেন"[৮৭] এবং তিনি "যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আর সৎকর্মশীল, তাদের সাথে আছেন।"[৮৮]

কাতাদাহ ﵀ বলেন,

> "যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। কারও সাথে যদি আল্লাহ থাকেন, তাহলে তো সে এমন পক্ষকে নিজের সাথে পেল যে কখনো পরাজিত হবে না; এমন পাহারাদার পেল, যে কখনো ঘুমাবে না; এমন পথপ্রদর্শক পেল, যে কখনো পথ হারাবে না।"[৮৯]

একজন সালাফ তাঁর এক ভাইয়ের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, "পর সমাচার এই যে...আল্লাহ যদি তোমার সাথে থাকেন, তাহলে তোমার আর ভয় কিসের? তিনি যদি তোমার বিরুদ্ধে থাকেন, তাহলে তুমি আর কার উপর আশা-ভরসা করবে? সালাম।"

এই "সঙ্গে থাকার বিষয়"টি বিশেষ এবং আলাদা, যা কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। এখানে সাধারণভাবে "সঙ্গে থাকা"র কথা বোঝাচ্ছে না, যার কথা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে :

---

[৮৭] সূরাহ আর-রা'দ, ১৩ : ৩৩

[৮৮] সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ১২৮

[৮৯] আবু নুয়াইম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪০

"...তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন..."[১০]

"কিন্তু তারা আল্লাহ হতে গোপন করতে পারে না, কেননা যে সময়ে তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তখনো তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন..."[১১]

বিশেষ "সঙ্গে থাকা" বলতে সাহায্য, সহযোগিতা ও হেফাজত করা বোঝায়। যেমনটি আল্লাহ বলেছিলেন মূসা عليه السلام ও হারুন عليه السلام-কে

"...আমি তোমাদের সাথেই আছি। আমি (সবকিছু) শুনি ও দেখি।"[১২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"...সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'চিন্তা কোরো না, আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।'..."[১৩]

নবীজি ﷺ আবু বকর رضي الله عنه-কে বলেছিলেন, "এমন দুইজনের ব্যাপারে তুমি কী মনে করো, যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ?"[১৪]

এখানে "সঙ্গে থাকা" বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত বিষয়টির মতো নয় :

"...তিনজনের মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন আল্লাহ হন না। আর পাঁচজনেও হয় না ষষ্ঠজন তিনি ছাড়া। এর কমসংখ্যকেও হয় না, আর বেশিসংখ্যকেও না, তিনি তাদের সঙ্গে থাকা ব্যতীত, তারা যেখানেই থাকুক না কেন..."[১৫]

এটি সাধারণ অর্থে এবং যে কারও ক্ষেত্রেই সত্য।[১৬] আর বিশেষায়িত "সঙ্গে থাকা"র কথা বলা হয়েছে এই হাদীসে,

---

[১০] সূরাহ আল-হাদীদ, ৫৭ : ৪
[১১] সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ১০৮
[১২] সূরাহ ত্বা-হা, ২০ : ৪৬
[১৩] সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ৪০
[১৪] *বুখারি* : ৩৬৫৩-৩৯২২-৪৬৬৩; *মুসলিম* : ২৩৮১; আবু বাকর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।
[১৫] সূরাহ আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ৭
[১৬] লেখক *জামিউল উলুম* : খণ্ড ১, ৪৭১ পৃষ্ঠায় যোগ করেন, "এই 'সাথে থাকা'র অর্থ হলো তিনি জানেন তারা কী করে, তিনি তাদের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, সতর্ক নজরদারিকারী। এর ফলে তাঁর প্রতি ভয় তৈরি হয়।"

> "...বান্দা নফল ইবাদাত করার মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে আঘাত করে, তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে।"[৯৭]

কিতাব ও সুন্নাহর এমন প্রচুর উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে মহান প্রতিপালক তাদের নিকটবর্তী—যারা তাঁকে মান্য করে, তাকওয়া অবলম্বন করে, তাঁর নির্ধারিত সীমা হেফাজত করে এবং তাঁর অধিকারসমূহ আদায় করে।

তাবুকে যাওয়ার সময় বুনান আল-হাম্মাল এক খোলা ভূমিতে প্রবেশ করেন। সেখানে হঠাৎ তিনি একাকিত্ব বোধ করেন। তখন এক কণ্ঠ শোনা যায়, "কেন তুমি একা বোধ করছ? তোমার ভালোবাসার পাত্র (আল্লাহ) কি তোমার সাথে নন?"[৯৮]

অতএব যে কেউ আল্লাহকে হেফাজত করে ও তাঁর অধিকারসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হয়, সে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে নিজের সামনে ও আগে পাবে। সে তাঁরই মাঝে স্বস্তি খুঁজে পাবে এবং মাখলুকের বদলে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হবেন। হাদীসে আছে, "সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমান হলো—বান্দা জানবে যে—সে যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তার সাথে আছেন।" হাদীসটি *তাবারানি* ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।[৯৯]

---

[৯৭] *বুখারি* : ৬৫০২; আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। একই রকম হাদীস *মুসনাদু আহমাদে* আইশা ﷺ থেকে, তাবারানিতে আবু উমামা ﷺ থেকে, ইসমাঈলির *মুসনাদ আলিতে* আলি ﷺ থেকে, তাবারানিতে ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে, তাবারানিতে আনাস ﷺ থেকে, আবু ইয়ালাতে মায়মুনাহ ﷺ থেকে। *তাহকিক কালিমাতুল ইখলাস* গ্রন্থে ইবনু রজব বলেন, "এর অর্থ হলো, ভালোবাসা যখন হৃদয়কে ভরে ফেলে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখন কেবল রবের পছন্দনীয় কাজই করবে। এই অবস্থায় আত্মা প্রশান্তি বোধ করবে। কারণ, তা এমনই বিলীন হয়ে গেছে যে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে সে কেবল রবের ইচ্ছানুযায়ীই কাজ করে। হে আল্লাহর বান্দা, সেভাবে আল্লাহর ইবাদাত করো, যেমনটা তিনি চান। তুমি যেভাবে চাও, সেভাবে না। শেষোক্ত পদ্ধতিতে ইবাদাতকারী বান্দা যেন নড়বড়ে কিনারায় দাঁড়িয়ে ইবাদাত করছে। তার সাথে ভালো কিছু ঘটলে সে খুশি থাকে। কিন্তু পরীক্ষা এলে সে পেছন ফিরে চলে যায়। ফলে দুনিয়া ও আখিরাত দুইই হারায়। প্রজ্ঞা ও ভালোবাসা যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, বান্দা তখন তার রবের ইচ্ছানুযায়ীই চলে।"

[৯৮] আবু নুয়াইম : খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩২৪

[৯৯] তাবারানি, *আল-কাবির* এবং *আল-আসওয়াত* : ৮৭৯৬; আবু নুয়াইম : খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২৪; আবু উবাদাহ ইবনুস সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত। সুয়ুতি, *আল-জামিউস সগীর* : ১৪২৩ এবং আলবানি, আয-যঈফাহ, ২৫৮৯-এ একে যঈফ বলেছেন

এই বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে।[১০০]

এক প্রাজ্ঞ আলিম একা একা সফর করছিলেন। কিছু মানুষ তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য এলে তিনি এই কবিতা দিয়ে উত্তর দেন :

যখন যাত্রা করি মোরা এমনকি রাতেও,
তোমার সঙ্গ আর যিকির শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

শিবলি ﷺ এই কবিতা প্রায়ই পাঠ করতেন এবং কখনো কখনো এটি আবৃত্তি করে মজলিস শেষ করে উঠতেন।

---

১০০ *কাশফুল কুরবাহ* গ্রন্থে ইবনু রজব লেখেন, "তাঁদের অনেকের মাখলুকের সাথে ভাব আদানপ্রদানের শক্তিই থাকত না। তাই তাঁরা প্রিয়তম রবের সাথে একা থাকার জন্য নির্জনে পালিয়ে যেতেন। এ জন্যই তাঁদের অনেকে লম্বা সময় নির্জনবাস করতেন। তাঁদের একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনি কি একাকিত্বের তিক্ততা অনুভব করেন না?' তিনি জবাব দেন, "কী করে তা অনুভব করতে পারি, যখন তিনি বলেছেন তিনি তাঁর স্মরণকারীর সঙ্গী?' আরেকজন বলেছিলেন, 'কী করে কেউ নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে পারে, যখন আল্লাহ তার সাথে আছেন?' আরেকজন বলেছিলেন, 'একা থাকলে নিঃসঙ্গতার তিক্ততা অনুভব করার কারণ হলো রবের সাথে প্রশান্তি লাভ করতে না পারার লক্ষণ।'
ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায ঘন ঘন নির্জনবাসে যেতেন। তাঁর ভাই তাঁকে এ জন্য তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'আপনি যদি মানুষদের মাঝে একজন মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার মানুষের সঙ্গও প্রয়োজন।' তিনি জবাব দেন, 'আপনি মানুষের মাঝে একজন মানুষ হয়ে থাকলে আপনার আল্লাহকে প্রয়োজন।' তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি মানুষের কাছ থেকে হিজরত করে চলে গেছেন। তাহলে আপনি কার সাথে থাকেন?' তিনি জবাব দেন, 'তাঁর সাথেই, যার ওয়াস্তে আমি হিজরত করেছি।' গাযওয়ানকে একবার নির্জনবাসের কারণে তিরস্কার করা হলে তিনি জবাব দেন, 'যিনি আমার প্রয়োজন পূরণ করেন, তাঁর সাথে বসে আমি প্রশান্তি লাভ করি।' তাঁরা গুরাবা ছিলেন বলে তাঁদের কাউকে পাগল ভাবা হতো, যেমনটা ভাবা হয়েছিল ওয়াইসকে। আবু মুসলিম আল-খাওলানি এত যিকর করতেন যে, তাঁর জিহ্বা সব সময় নড়তে থাকত। এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সঙ্গী কি পাগল নাকি?' আবু মুসলিম জবাব দেন, 'না রে, ভাই! এটা বরং পাগলামির চিকিৎসা।' তাঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল-হাসান বলেন, 'অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের দেখে অসুস্থ মনে করে, অথচ তাঁরা অসুস্থতা থেকে বহু দূরে! সে বলবে যে তাঁরা সংবিৎ হারিয়ে বসেছেন। অবশ্যই তাঁরা সংবিৎ হারিয়েছেন এক মহান বিষয়ের কারণে, তাদের অপবাদ থেকে যা অনেক মহান। আল্লাহর কসম! তোমার দুনিয়াবি জিনিস থেকে (মুখ ফিরিয়ে) তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।' এ বিষয়েই কবি বলেছেন :
"ভালোবাসার পবিত্রতার শপথ, আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই,
হে প্রতিপালক, আমার লক্ষ্য কেবল আপনাকে ঘিরেই।
আপনার প্রতি টান দেখে তারা বলে, 'এ লোক পাগল নির্ঘাত'।
আমি বলি, 'এ পাগলামি কখনো ছেড়ে না যাক।"

অধ্যায় চার

আল্লাহকে জানা

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে জেনো, তাহলে তোমার বিপদের সময় তিনি তোমাকে জানবেন।" বান্দা যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা হেফাজত করে এবং তাঁর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকে, এর অর্থ হলো সে আল্লাহকে জানতে শিখেছে। এর ফলে আল্লাহ ও তার মাঝে এক আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সম্পর্ক তৈরি হয়, যার ফলে বিপদ-দুর্দশার সময় আল্লাহ তাকে জানবেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বান্দা যে আমল করেছে, তা আল্লাহ জানবেন এবং এই জানার বদৌলতে তাকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।

এই জানা থাকার বিষয়টিও বিশেষ ও আলাদা, যা বান্দার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নৈকট্য, ভালোবাসা ও দু'আ কবুল করার সাথে সম্পর্কিত। এ ছাড়া মাখলুকের কোনো কিছুই যে আল্লাহর কাছ থেকে গোপন নেই, সেটি হচ্ছে সাধারণভাবে জানা থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

> **"...তিনি তোমাদের ভালোমতোই জানেন যখন তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর যখন তোমরা তোমাদের মায়ের গর্ভে ভ্রূণ-অবস্থায় ছিলে..."**[১০১]

> **"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি; আর তার প্রবৃত্তি তাকে (নিত্যনতুন) কী কুমন্ত্রণা দেয়, তাও আমি জানি..."**[১০২]

আর এই বিশেষ "জানা থাকা"র ব্যাপারটি এই হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ : "...বান্দা নফল ইবাদাত করার মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে আঘাত করে, তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে।"[১০৩]

---

[১০১] সূরাহ আন-নাজম, ৫৩ : ৩২

[১০২] সূরাহ কাফ, ৫০ : ১৬

[১০৩] *বুখারি* : ৬৫০২; আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

শাওয়ানাহ নামের এক ইবাদাতগুজার নারীর সাথে সাক্ষাৎ করে ফুদাইল বললেন তাঁর জন্য দু'আ করতে। তিনি বলেন, "কিসে আপনাকে তাঁর থেকে পৃথক করছে? আপনি (নিজেই) যদি দু'আ করেন, (তাহলেও) তিনি জবাব দেবেন।" এ কথা শুনে ফুদাইল আবেগের আতিশয্যে মূর্ছা গেলেন।[১০৪]

আবু জাফর আস-সাইহ ﵀ বর্ণনা করেন, হাজ্জাজের কাছ থেকে পালিয়ে আল-হাসান ﵀ এলেন হাবিব আবু মুহাম্মাদ ﵀-এর কাছে। বললেন, "আবু মুহাম্মাদ, আমাকে হাজ্জাজের বাহিনীর কাছ থেকে লুকান। তারা আমাকে ধাওয়া করেছে।" তিনি জবাব দিলেন, "আবু সাইদ, আমি লজ্জিত! আপনার সাথে আপনার প্রতিপালকের কি এমন কোনো আস্থার সম্পর্ক নেই যে, আপনি তার কাছে দু'আ করবেন আর তিনি আপনাকে এই সবকিছু থেকে লুকিয়ে ফেলবেন? আসুন, ঘরে ঢুকুন।" এর কিছুক্ষণ পর হাজ্জাজের বাহিনীও সেই ঘরে ঢুকল কিন্তু তাঁকে খুঁজে পেল না। এই খবর হাজ্জাজের কানে পৌঁছানো হলে তিনি বলেন, "বরং সে সেই ঘরের ভেতরেই ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের দৃষ্টি ঢেকে দিয়েছেন বলে তারা তাকে দেখতে পায়নি।"

আল্লাহর ব্যাপারে এই বিশেষ জ্ঞান যখন লাভ হয়, তখন বান্দা ও রবের মাঝে প্রশান্তি-ঘনিষ্ঠতা ও লজ্জাশীলতার অনুভূতিসম্পন্ন এক সম্পর্ক তৈরি হয়। প্রত্যেক মুমিনের মাঝেই সাধারণভাবে যে জ্ঞান থাকে, এই জ্ঞান সে রকম নয়। এই বিশেষ ধরনের জ্ঞান লাভের জন্যই সাধকগণ কঠোর সাধনা করে থাকেন।

আবু সুলাইমান ﵀ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, "আমি গত রাতটি নারীদের ব্যাপারে কথা বলে কাটিয়েছি।" তিনি বললেন, "ধিক তোমাকে! তোমার কি তাঁর (আল্লাহর) প্রতি কোনো লজ্জা নেই? সারা রাত তিনি তোমাকে দেখেছেন যে, তুমি তাঁকে ছাড়া অন্য কারও স্মরণ করে রাত কাটিয়েছ। কিন্তু তুমি যাকে জানোই না, তাঁর সামনে লজ্জিত কী করে হবে?"

আহমাদ ইবনু আসিম আল-আনতাকি ﵀ বলেন, "আমার ইচ্ছা হলো আমার মনিবকে জানার পর মৃত্যুবরণ করা। জানার অর্থ (তাঁর অস্তিত্ব) স্বীকার করা নয়; বরং এটি এমন এক ধরনের জ্ঞান যা লাভ করলে তাঁর সামনে লজ্জিত হওয়া যায়।"

---

[১০৪] আবু নুয়াইম : খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১১৬, হাদীস নং ১১৫৬৭-তে আরও বলা হয়, ফুদাইল বলেন, "আমাদের আনুগত্যের মহত্ত্ব দিয়ে মহান করুন, আর অবাধ্যতার অপমান দিয়ে অপমানিত করবেন না।"

এই বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষ ধরনের "জানা"র মাধ্যমে বান্দা তার রবের প্রতি সন্তুষ্ট হতে শেখে, তাঁর উপর নির্ভর করতে শেখে, সকল বিপদ হতে উদ্ধার হওয়ার ব্যাপারে তাঁর উপর আস্থা রাখতে শেখে। ঠিক একইভাবে এই জ্ঞানের ফলে রবও বান্দার দু'আ কবুল করতে থাকেন।

হাসান আল-বাসরি ﵀ যখন হাজ্জাজের কাছ থেকে পালাচ্ছিলেন, তাঁকে বসরায় চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে বললেন, "আমি নিজের এলাকা, পরিবার, ভাইদের ছেড়ে যাব? আমার প্রতিপালকের ব্যাপারে আমার জ্ঞান এবং যেই নিয়ামত দিয়ে তিনি আমাকে ধন্য করেছেন, এতে আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে তিনি আমাকে বাঁচাবেন ও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবেন, ইনশাআল্লাহ তা'আলা।" হাজ্জাজ তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারেননি; বরং এ ঘটনার পর তিনি হাসানকে অত্যন্ত সম্মান করতে শুরু করেন এবং তাঁর ব্যাপারে ভালো ভালো কথা বলেন।

মারুফকে ﵀ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কিসে আপনাকে নির্জনে গিয়ে ইবাদাত করতে উদ্বুদ্ধ করল?" সম্ভাব্য কারণ হিসেবে প্রশ্নকারী মৃত্যু, আল-বারযাখ, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি জবাব দিলেন, "এসব আবার কী! এগুলো তো তাঁরই হাতে। তোমার ও তাঁর মাঝে যখন জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, তখন তিনিই এই সকল ঘাঁটিতে তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন।"

*তিরমিযি*তে আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত এই হাদীস এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তোলে। রাসূল ﷺ বলেন, "যে চায় তার দুঃখ-দুর্দশার সময় আল্লাহ তার দু'আ কবুল করুন, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি বেশি দু'আ করে।"[১০৫]

ইবনু আবিদ্দুনিয়া ﵀ , ইবনু আবি হাতিম ﵀, ইবনু জারির ﵀ ও অন্যরা ইয়াযিদ আর-রাকাশির সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মাছের পেটে থাকা অবস্থায় ইউনুস ﵇ যখন দু'আ করছিলেন, তখন ফেরেশতারা বললেন, 'এ তো একটি পরিচিত কণ্ঠ, অথচ আসছে এক অপরিচিত জায়গা থেকে।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনি কে?'

---

[১০৫] তিরমিযি : ৩৩৮২; তিনি একে গারীব বলেছেন। হাকিম : ১৯৯৭ একে গারীব বলেছেন। যাহাবি একমত। মুনযিরি, *আত-তারগীব* : খণ্ড, ২, ৩৮৮ পৃষ্ঠাতে বলেন এর ইসনাদ সহীহ বা হাসান। সুয়ূতি, *জামিউস সগির* : ৮৭৪৩ এবং আলবানি, *আস-সহীহাহ* : ৫৯৩ ও *সহীহুত তারগীব* : ১৬২৮-এ একে হাসান বলেছেন।

আল্লাহ বললেন, 'আমার বান্দা ইউনুস।' তাঁরা বললেন, 'আপনার বান্দা ইউনুস, যার সকল আমল ও সকল দু'আ কবুল করা হয়েছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' তাঁরা বললেন, 'হে প্রতিপালক, তিনি সুখের সময়ে যা করতেন, তার উসিলায় আপনি কি তাঁর এই দুঃখের সময় তাঁর প্রতি রহম করবেন না?' তিনি জবাব দিলেন, 'অবশ্যই।' তিনি মাছকে আদেশ দিলেন ইউনুস ﷺ-কে মরুভূমির উপকূলে বের করে দিতে।"[১০৬]

দাহহাক ইবনু কায়স ﷺ বলেন, "স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ করো, তিনি তোমাকে তোমার দুর্দশার সময়ে স্মরণ করবেন। ইউনুস ﷺ আল্লাহকে স্মরণ করতেন। পরে যখন মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, আল্লাহ তা'আলা বললেন :

"সে যদি আল্লাহর তাসবীহকারী না হতো, তাহলে নিশ্চিতই তাকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হতো।"[১০৭]

ফিরআউন ছিল এক যালিম, যে আল্লাহর স্মরণের প্রতি গাফেল ছিল। সে ডুবে যাওয়ার সময় বলেছিল, "আমি ঈমান আনলাম।" আল্লাহ তা'আলা বললেন :

"কী! এখন? আগে তো অমান্য করেছ আর ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত থেকেছ।"[১০৮]

রিশদিন ইবনু সাদ বলেছেন, "আবুদ্দারদা ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি উপদেশ চাইলো। তিনি জবাব দিলেন, 'স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করো, তিনি তোমার দুর্দশান সময়ে তোমাকে স্মরণ করবেন।'"[১০৯]

সালমান আল-ফারিসি ﷺ বলেন,

> "কেউ যদি স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ করতে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে কোনো বিপদে পড়ে দু'আ করলে ফেরেশতারা বলেন, 'এ তো একটি পরিচিত কণ্ঠ!' তারপর তাঁরা তার জন্য সুপারিশ করেন। আর সে যদি স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ করতে অভ্যস্ত না থাকে, তাহলে সে কোনো

---

[১০৬] ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহর* ২৫ পৃষ্ঠায় এর ইসনাদ যঈফ বলেছেন।
[১০৭] সূরাহ আস-সফফাত, ৩৭ : ১৪৩-১৪৪
[১০৮] সূরাহ ইউনুস, ১০ : ৯১
[১০৯] আবু নুয়াইম : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৯

বিপদে পড়ে দু'আ করলে ফেরেশতারা বলেন, 'এ তো একটি অপরিচিত কণ্ঠ!' তাঁরা তার জন্য সুপারিশ করেন না।"

পাথর দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে আটকে পড়া তিন ব্যক্তির হাদীসও এখানে উল্লেখ্য। বিপদে পড়ে তাঁরা এমন নেক আমলের উসিলা দিয়ে দু'আ করেছিলেন, যেগুলো তাঁরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে করেছিলেন। পিতামাতার প্রতি সদাচরণ, অশ্লীল কাজ পরিত্যাগ আর আমানত রক্ষা করা।[১১০]

এটি জানা কথা যে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করলে তার দুর্দশার সময় আল্লাহ তাকে স্মরণ করবেন। জীবনে যত বিপদ আসে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো মৃত্যু। তার মৃত্যু-পরবর্তী গন্তব্য যদি ভালো না হয়, তাহলে মৃত্যুর পরের ঘাঁটিগুলো এরচেয়ে ভয়াবহ হবে। আর গন্তব্য ভালো হলে মৃত্যুই হবে সবচেয়ে হালকা বিপদ। তাই এই বিপদের সময় আসার আগেই মানুষকে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে ও আমল তৈরি করতে হবে। কেউ জানে না কোন দিন বা কোন রাতে তার মৃত্যু চলে আসবে।

মৃত্যুর সময় নেক আমলের কথা স্মরণ করতে পারলে রবের প্রতি বান্দার সুধারণা তীব্র হয়, মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব হয় ও আশার সঞ্চার হয়।

একজন সালাফ মোটামুটি এমন একটি কথা বলেছিলেন, "তাঁরা নেক আমলের একটি ভান্ডার প্রস্তুত রাখা ওয়াজিব মনে করতেন, যাতে মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব হয়।"

কোনো নেক আমল—যেমন হাজ্জ, জিহাদ, সিয়াম ইত্যাদি—করার পরপরই মারা যাওয়াকে তাঁরা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ বলে বিশ্বাস করতেন।

নাখাই ﷬ বলেছেন, "মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে তার নেক আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াকে তাঁরা প্রশংসনীয় বলে জানতেন। এতে করে রবের প্রতি বান্দার সুধারণা তৈরি হয়।"

আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামি ﷬ তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "আমি কী করে আমার প্রতিপালকের প্রতি সুধারণা না রাখতে পারি, অথচ আমি আশিটি রমাদান যাবৎ সিয়াম পালন করেছি?"[১১১]

---

[১১০] *বুখারি* : ২২১৫-২২৭২-২৩৩৩-৩৪৬৫-৫৯৭৪ এবং *মুসলিম* : ২৭৪৩; ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত।

[১১১] আবু নুয়াইম : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯২

আবু বাকর ইবনু আইয়্যাশ ﷺ-এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তাঁর আশপাশের মানুষেরা কান্না করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "কান্না কোরো না। আমি এই মুসাল্লায় তেরো হাজার বার কুরআন সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করেছি।"

বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন, "তোমার কি মনে হয় আল্লাহ তোমার পিতার জীবনের চল্লিশটি বছর নষ্ট করে দেবেন, যার প্রতিটি রাতে সে কুরআন সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করেছে?"[১১২]

একজন সালাফ তাঁর মৃত্যুশয্যায় তাঁর পুত্রকে পাশে বসে কাঁদতে দেখলেন। তিনি বললেন, "কেঁদো না। তোমার পিতা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করেননি।"

আদাম ইবনু আবু ইয়্যাস ﷺ মৃত্যুশয্যায় কাপড় জড়ানো অবস্থায়ই সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করেন। তিনি বললেন, "আপনার প্রতি আমার ভালোবাসার উসিলায় এই ভয়াবহ সময়ে আমার প্রতি সদয় হোন। এই মহাদিবসের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় সারাক্ষণ আমার সকল আশা-ভরসা আপনার প্রতি ছিল। লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ!" এতটুকু বলে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।[১১৩]

দুনিয়াবিরাগী সাধক আব্দুস সামাদ ﷺ তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু, এই সময়টির জন্যই আমি আপনাকে আমার গুপ্ত ধনভান্ডার হিসেবে রেখেছি। এই সময়টির জন্যই আমি আপনার হেফাজত করেছি। আপনার ব্যাপারে আমার সুধারণাকে বাস্তবায়ন করুন।"[১১৪]

ইবনু আকিল ﷺ-এর মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে বসে কান্নারত নারীদের তিনি বলেন, "পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমি তাঁর জন্য রায় গোপন রেখে এসেছি। আজ আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিতে একা থাকতে দাও।"

কারামিতা* সম্প্রদায় (ইসমাঈলি শিয়াদের একটি শাখা) হাজীগণের উপর আক্রমণ করে। তখন তাঁরা তাওয়াফ করছিলেন। সুফি আলি ইবনু বাকওয়াইহ ﷺ সেখানে ছিলেন। তিনিও তাওয়াফ করছিলেন। কিন্তু তরবারির উপর্যুপরি আঘাত

---

[১১২] খাতিব, *তারিখ*: খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৩৮৩

[১১৩] খাতিব, *তারিখ*: খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯

[১১৪] ইবনুল জাওযি, *সিফাতুস সাফওয়াহ*: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭২

***কারামিতা সম্প্রদায় :** বাতিনিয়্যাহ গোষ্ঠীর মতো আকীদা পোষণকারী একটি দল এবং মায়মুন ইবনু দায়সানের অনুসারী। বাতিনিয়্যাহ হলো শিয়াদের একটি দল, যারা ইসমাঈল ইবনু জাফারের অনুসারী। এরা বিশ্বাস করে যে, কুরআন-হাদীস কেবল ভাসা ভাসা কিছু বক্তব্যের সমষ্টি, যার অন্তর্নিহিত আসল বক্তব্য বাহ্যিক বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। জান্নাত, জাহান্নাম ও আখিরাতের ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত এ ব্যাখ্যাগুলো তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উদাহরণ।

পেয়েও তিনি তাওয়াফ থামাননি। এ অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু চলে আসে। তখন তিনি এ কবিতা পাঠ করছিলেন :

প্রেমিকেরা সেজদা দিয়ে শুয়ে আছে যে ঘরে,
আসহাবে কাহফ ঘুমোয় যেমন শতাব্দী ধরে।
যদি বলে তারা যুদ্ধের দিন আগে থেকেই ছিল মৃত,
ওয়াল্লাহি! এ কথা মিথ্যে হিসেবে হবে না কভু ধৃত।

যে কেউ জীবদ্দশায় আল্লাহর সীমা হেফাজত করে ও তাঁর কথা মান্য করে, তার মৃত্যুশয্যায় আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন ও ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করবেন। কবরে ফেরেশতাদের সওয়ালের মুখে আল্লাহ তাকে শক্তিশালী কালিমাহ দিয়ে শক্তিশালী করবেন, কবরের আযাবকে তার থেকে হটিয়ে দেবেন, একাকিত্ব আর অন্ধকারের জীবনে তার জন্য সান্ত্বনা হবেন।

একজন সালাফ বলেছিলেন, "কবরে প্রবেশ করার সময় যদি আল্লাহ তোমার সাথে থাকেন, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তও হবে না, একাকীও হবে না।"

একজন নেককার আলিমের মৃত্যুর পর তিনি স্বপ্নে দেখা দেন। তাঁকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "আমার মহাপবিত্র ও সুমহান প্রতিপালক আমাকে সঙ্গ দেন।"

দুনিয়ার একাকিত্বে আল্লাহ যার সঙ্গী হন, সে আশা করতেই পারে যে কবরের একাকিত্বেও আল্লাহ তার সঙ্গী হবেন। এ অর্থেই একজন সালাফ বলেছিলেন :

একাকিত্বে আমার সঙ্গী হও, হে রব।
আমি বিশ্বাস করি তোমার ওয়াহী সব।
আল্লাহর দিকে যাত্রায় আমি করি না কোনো ভয়,
আমার প্রতি তাঁর দয়া যে পরিবারের চেয়ে বেশি হয়।"

কিয়ামাতের ভয়াবহতা ও কাঠিন্যের ব্যাপারেও এ কথা সত্য। আল্লাহ যখন তাঁর অনুগত বান্দার দেখভাল করেন, তিনি তাকে এই সবকিছু থেকে উদ্ধার করে নেবেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

"যে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে কোনো না-কোনো পথে করে দেবেন।"[১১৫]

[১১৫] সূরাহ আত-তলাক, ৬৫ : ২

এর ব্যাখ্যায় কাতাদাহ ﵀ বলেন, "অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রণা ও কিয়ামাতের ভয়াবহতা থেকে (বের হওয়ার পথ করে দেবেন)।"[১১৬]

আলি ইবনু আবু তালহা থেকে বর্ণিত আব্বাস ﵄ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আমি (আল্লাহ) তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সব কষ্ট থেকে মুক্তি দেবো।"[১১৭]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন :

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' অতঃপর (সে কথার উপর) সুদৃঢ় থাকে, ফেরেশতারা তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় আর বলে, 'তোমরা ভয় কোরো না, চিন্তা কোরো না। আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছে।'"[১১৮]

এর ব্যাখ্যায় যাইদ ইবনু আসলাম বলেছেন, "মৃত্যুর ক্ষণে, কবরে ও কিয়ামাতের দিন তাকে সুসংবাদ দেওয়া হবে। সুসংবাদের আনন্দ হৃদয় থেকে বের হওয়ার আগেই সে নিজেকে জান্নাতের সামনে আবিষ্কার করবে।"[১১৯]

সাবিত আল-বুনানি ﵀ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "আমাদের কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, যে দুজন ফেরেশতা তাকে এ দুনিয়ায় সঙ্গ দিতেন, তাঁরা কবর থেকে পুনরুত্থানের দিন মুমিনের সাথে দেখা করে বলবেন, 'ভয় কোরো না, চিন্তা কোরো না।' আর আল্লাহ তার ভয় লাঘব করে চোখকে প্রশান্তি দেবেন। কিয়ামাতের দিন মানুষকে যত বিপদই গ্রাস করবে, মুমিনের জন্য তা প্রশান্তিদায়ক হবে। কারণ, আল্লাহ তাকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং দুনিয়ায় সে নেক আমল করেছে।"[১২০] ইবনু আবি হাতিম ﵀ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে বর্ণনাগুলো এসেছে।

আর যারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে জানে না, তার দুঃখ-দুর্দশার সময়ে আল্লাহও তাকে জানবেন না–হোক তা দুনিয়া বা আখিরাতে। দুনিয়ায় এসব

---

[১১৬] সুয়ুতি, *আদ্দুররুল মানসুর* : খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৫৩৭ একে আব্দ ইবনু হুমাইদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; আবু নুয়াইম, *আল-হিলইয়াহ* : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪০

[১১৭] তাবারি : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩; সুয়ুতি, *আদ্দুররুল মানসুর* : খণ্ড ১৪, ৫৩৮ পৃষ্ঠায় একে ইবনুল মুনযির ও ইবনু আবি হাতিমের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

[১১৮] সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০; অনুরূপ সূরাহ আল-আহকাফ, ৪৬ : ১৩

[১১৯] সুয়ুতি, *আদ্দুররুল মানসুর* : খণ্ড ১৩, ১০৭ পৃষ্ঠায় একে ইবনু আবি শাইবাহ ইবনু আবি হাতিমের সাথে সম্পৃক্ত করেন।

[১২০] সুয়ুতি, *আদ্দুররুল মানসুর* : খণ্ড ১৩, ১০৮ পৃষ্ঠায় একে ইবনুল মুনযির ও ইবনু আবি হাতিমের সাথে সম্পৃক্ত করেন।

মানুষের অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে, আখিরাতে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। কারণ, তাদের কোনো রক্ষাকারী বা সাহায্যকারী থাকবে না।

অধ্যায় পাঁচ

আল্লাহর কাছে চাওয়া

রাসূল ﷺ বলেছেন, "যখন চাইবে, আল্লাহরই কাছে চাইবে।" আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুধু তারই কাছে দু'আ করার আদেশ করেছেন। অন্য কারও কাছে দু'আ করা নিষিদ্ধ করেছেন।

> **"তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা করো।"[১২১]**

*তিরমিযি*তে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ؓ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

> "আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। কারণ, তাঁর কাছে চাওয়াকে আল্লাহ ভালোবাসেন।"[১২২]

এ ছাড়া আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর কাছে না চাওয়া হলে তিনি রাগান্বিত হন।"[১২৩]

আরেক হাদীসে আছে,

> "আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা বিশুদ্ধচিত্তে ও ক্রমাগত দু'আ করতে থাকে।"[১২৪]

---

[১২১] সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ৩২

[১২২] তিরমিযি : ৩৫৭১; তাবারানি, *আল-কাবির* : খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১২৪ ইজলুনি, *কাশফুল খফা* : ১৫০৭-এ বলেন ইরাকি একে যঈফ এবং ইবনু হাজার একে হাসান বলেছেন। এক যঈফ ঘোষণা করেন আলবানি, *আয-যঈফা* : ৪৯২; ইরাকি, *আল-মুগনি* : ৯৮৭-তে বলেন, এর বর্ণনাসূত্রে হাম্মাদ বিন ওয়াকিদ আছেন, যাকে ইবনু মাইন ও অন্যান্যরা যঈফ বলেছেন। সাখাওয়ি, *মাকসাদুল হাসানাহ* : ১৯৫-এ বায়হাকির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হাম্মাদ একাই এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি শক্তিশালী নন।

[১২৩] আহমাদ : ৯৭০১; তিরমিযি : ৩৩৭৩; ইবনু মাজাহ : ৩৮২৭
এর ইসনাদ যঈফ বলেছেন যাহাবি, আল-মিযান : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৩৮; আরনাউত ও অন্যান্য, তবে অন্যান্য সমর্থনকারী হাদীসের কারণে আলবানি এক হাসান বলেছেন, আস-সহীহাহ : ২৬৫৪

[১২৪] তাবারানি, *আদ-দু'আ* : ২০; বায়হাকি, *শুয়াবুল ঈমান* : ১১০৮, কুদাই : ১০৬৯; আইশাহ ؓ থেকে বর্ণিত। তিরমিযি হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইবনু আদি একে বাতিল বলেছেন; একই কথা বলেছেন আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ৬৩৭; *আল-ইরওয়া* : ৬৭৭-এ তিনি একে মাওযু

আরেক হাদীসে আছে, "তোমাদের সকলের উচিত সকল প্রয়োজনে রবের কাছেই চাওয়া, এমনকি জুতোর ফিতা ছিঁড়ে গেলেও।"[১২৫]

একই অর্থসম্পন্ন আরও অনেক হাদীস রয়েছে। এ ছাড়া মাখলুকের কাছে চাইতে নিষেধ করেও অনেক হাদীস রয়েছে।

ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "ধনী হওয়া সত্ত্বেও এক ব্যক্তি কেবল চাইতেই থাকবে, চাইতেই থাকবে। শেষমেশ তার চেহারা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর সামনে তার কোনো চেহারাই থাকবে না।"[১২৬]

রাসূল ﷺ তাঁর একদল সাহাবার কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মানুষের কাছে কিছু চাইবেন না।[১২৭] তাঁদের মাঝে আবু বকর ﵁, আবু যার ﵁ ও সাওবান ﵁ ছিলেন। তাঁদের চাবুক বা উটের রশি পড়ে গেলেও তাঁরা তা অন্য কাউকে তুলে দিতে ডাকতেন না।

জেনে রাখুন, যৌক্তিক ও শরয়ী উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু আল্লাহর কাছে চাওয়াটাই সমীচীন। তাঁর সৃষ্টির কাছে নয়।

বলেন; অনুরূপ ইবনু হাজার, *তালখিসুল হাবির* : ৭১৬; উকাইলি : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৫৪, হাদিস নং ২০৮৫; ইবনু আদি, *আল-কামিল* : খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৫০০-৫০১

বুখারি : ৬৪৩০ আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমার দু'আ কবুল করা হতে থাকবে যতক্ষণ না তুমি এই বলে অধৈর্য প্রকাশ করো, 'আমি রবের কাছে দু'আ করেছি, কিন্তু তিনি জবাব দেননি।'" *মুসলিম* : ২৭৩৫ আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "বান্দার দু'আ কবুল করা হতে থাকবে যতক্ষণ না সে হারাম কিছুর জন্য দু'আ করে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ভঙ্গ করে বা অধৈর্য হয়।" জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল, অধৈর্য কী?" তিনি বললেন, "সে বলে, 'আমি অনেক অনেক দু'আ করেছি, কিন্তু জবাব পাইনি' তারপর সে হতাশ হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দেয়।"

[১২৫] তিরমিযি : ৩৬৮২; আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত; তিরমিযি একে গারীব বলেছেন। একে যঈফ বলেছেন আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ১৩৬২

[১২৬] . বাযযার : ৯১৯; তাবারানি, আল-কাবির : খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ৩৩৩, হাদিস নং ৭৯০; মুয়ায ইবনু আম্মার ﵁ থেকে বর্ণিত, ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে নয়। ইবনু আবি হাতিম, আল-জারহ ওয়া তা'দিল : খণ্ড ৮, ২৮২ পৃষ্ঠাতে একে মুনকার বলেছেন। বুখারি : ১৪৭৪ এবং মুসলিম : ১০৪০ ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কোনো ব্যক্তি মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে থাকে। এভাবে করে সে কিয়ামাতের দিন মুখমণ্ডলে এক টুকরাও মাংস ছাড়া দণ্ডায়মান হবে।" আহমাদ : ২২৪২০ এবং বাযযার : ৯২৩-এ সাওবান ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে কেউ তার অপ্রয়োজনীয় জিনিস যেচে বেড়ায়, এটি কিয়ামাতের দিন তার চেহারা নষ্ট করে দেবে।" বাযযার এর ইসনাদ হাসান বলেছেন। আরনাউত ও অন্যান্যদের মতে সহীহ।

[১২৭] *মুসলিম* : ১০৪৩; আওফ ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত।

কোনো কিছু চাওয়ার অর্থ হলো—যার কাছে চাওয়া হচ্ছে তার সামনে নিজের মর্যাদা উৎসর্গ করা ও নিজেকে নীচ করা। এটি শুধু আল্লাহর সাথেই প্রযোজ্য। ইবাদাত ও দু'আর মাধ্যমে শুধু আল্লাহর সামনেই অবনত হতে হয়। এটি সত্যিকার ভালোবাসারও একটি লক্ষণ।

ইউসুফ ইবনুল হুসাইন ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "প্রেমিকদের কী হলো যে, তারা নিজেদের ভালোবাসায় অবনত করে এত আনন্দ পায়?" তিনি উত্তর দেন :

ভালোবাসায় নীচতাই হলো মহান,
প্রেমাস্পদের কাছে সমর্পণই সম্মান।

এই ধরনের বিনয় ও ভালোবাসা কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। এগুলো ইবাদাতেরই বিভিন্ন উপাদান, যা একমাত্র সত্যিকার উপাস্যের প্রাপ্য।

ইমাম আহমাদ ﷺ দু'আ করার সময় বলতেন,

> "হে আল্লাহ, যেভাবে আপনি আমার চেহারাকে আপনি ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা থেকে হেফাজত করেছেন, তেমনিভাবে আমাকে আপনি ছাড়া অন্য কারও কাছে চাওয়া থেকে হেফাজত করুন।"

আবুল খাইর আল-আত্তা ﷺ বলেন, "আমি এক বছর মক্কায় ছিলাম। আমি দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও ক্ষুধাপীড়িত হয়ে পড়ি। যতবারই আমি ভিক্ষা করতে বের হতে নিতাম, একটা কণ্ঠ বলে উঠত, 'আমাকে সেজদাকারী চেহারাটিকে কি তুমি অন্য কারও কাছে নিবেদন করতে চললে?'"

এই অর্থে একজন সালাফ বলেছিলেন :
আল্লাহর কাছে একবার চেহারা সঁপেছে যে,
ভিক্ষায় প্রাচুর্য এলেও ভিখারি হবে না সে।
দাঁড়িপাল্লায় দু'আর সাথে ওজন করলে সবই,
দু'আই হবে ভারী সবচেয়ে, বাকিরা হালকা খুবই।
ভিক্ষা করেই চাও যদি-বা চেহারা করতে মলিন,
তাঁরই কাছে চাও, যিনি দানশীল, দয়ালু সীমাহীন।

সহীহ বুখারি ও *মুসলিমের* হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে, কিয়ামাতের দিন তার চেহারায় এক টুকরো মাংসও থাকবে না।[১২৮] কারণ, দুনিয়াতে সে এই চেহারার পবিত্রতা ও মহত্ত্ব নষ্ট করেছে।

[১২৮] *বুখারি* : ১৪৭৪; *মুসলিম* : ১০৪০

তাই কিয়ামাতের দিন আল্লাহ এই চেহারার বাহ্যিক সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়ে কেবল একটি কঙ্কাল বসিয়ে রাখবেন। এ ছাড়া এর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যও আল্লাহ কেড়ে নেবেন। ফলে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তির আর কোনো সম্মানই থাকবে না।

আল্লাহর কাছে চাওয়ার মাধ্যমে ইবাদাতের এক গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ রূপ প্রকাশ পায়। কারণ, এর মাধ্যমে বান্দা তার রবের কাছে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আর তার অসহায়ত্ব দূর করতে রবের সক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। কোনো সৃষ্টির কাছে কিছু চাওয়া হলো যুলুম। কারণ, মাখলুক নিজের কোনো উপকার করতে পারে না, নিজেকে কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে না—অন্যের লাভক্ষতি করতে পারা তো দূরের ব্যাপার। মাখলুকের কাছে চাওয়ার অর্থ হলো সক্ষম সত্তাকে সরিয়ে অক্ষম সত্তাকে সেই জায়গায় বসানো।

এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় *সহীহ মুসলিমে* আবু যার ﷺ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে, যেখানে রাসূল ﷺ বলেন, "হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল জিন ও মানুষ একত্র হয়ে আমার কাছে চায় আর আমি প্রত্যেককে তার প্রয়োজন পূরণ করে দিই, তাহলে আমার ভান্ডার থেকে ততটুকুও কমবে না যতটুকু সুচ ডুবিয়ে তুলে আনলে সাগর থেকে পানি কমে।"[১২৯]

তিরমিযির বর্ণনায় অতিরিক্ত অংশ আছে, "...এর কারণ, আমি দানশীল, প্রাচুর্যশালী, প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে, সুমহান। আমি যা ইচ্ছা, তা-ই করি। আমার পুরস্কার কেবল একটি শব্দ আর শাস্তিও কেবল একটি শব্দ। যখন আমি কোনো কিছু সংঘটনের ইচ্ছে করি, তখন কেবল বলি 'হও!' আর তা হয়ে যায়।"[১৩০]

তাহলে কী করে প্রাচুর্যশালীকে ত্যাগ করে একজন অভাবগ্রস্তের কাছে চাওয়া যেতে পারে? আজিব ব্যাপার!

একজন সালাফ বলেছিলেন, "আমি আল্লাহর কাছেই এই দুনিয়ার কোনো কিছু চাইতে লজ্জিত হই, যদিও তিনি এর মালিক। তাহলে আমি কী করে এমন কারও কাছে চাইতে পারি, যে এর মালিকই নয়?" অর্থাৎ, মাখলুক।

একজন সালাফ বিপদে পড়ে তাঁর এক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাওয়ার মনস্থির করলেন। স্বপ্নে এক ব্যক্তি দেখা দিয়ে তাঁকে বললেন,

---

[১২৯] *মুসলিম* : ২৫৭৭

[১৩০] আহমাদ : ২১৩৬৭-২১৩৬৯; তিরমিযি : ২৪৯৫; ইবনু মাজাহ : ৪২৫৭, তিরমিযি একে হাসান বলেছেন; আরনাউত ও অন্যান্যরা একে শাহীদের কারণে সহীহ বলেছেন।

মুক্ত ব্যক্তি সবই যখন পায় এক আল্লাহর কাছে,
বান্দার দিকে মন ফেরানো তখন কি তার সাজে?

তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে আবিষ্কার করলেন যে, তিনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে সন্তুষ্টচিত্তের অধিকারী।

একজন সালাফ বলেছেন, "আমি এক আসমানি কিতাবে এই কথাগুলো পড়েছি, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, বিপদের সময় আমি ছাড়া আর কারও কাছে কি আশা করা হয়? বিপদ (দেওয়া ও তুলে নেওয়ার ক্ষমতা) আমার হাতে। আমি চিরঞ্জীব, অমুখাপেক্ষী। আমি ছাড়া আর কারও কাছে আশা করা হয় কি অথবা দিনের শুরুতে কারও দরজায় কড়া নাড়া হয় কি? আমার কাছেই সকল ভান্ডারের চাবি আর আমার কাছে দু'আকারীর জন্য আমার দরজা খোলা। কে বলতে পারবে যে, কষ্টের সময় সে আমার কাছে চেয়েছে অথচ আমি তাকে নিরাশ করেছি? কে বলতে পারবে যে, বিপদের সময় সে আমার কাছে চেয়েছে অথচ আমি তাকে আশাহত করেছি? কে বলতে পারবে যে, সে আমার দরজায় কড়া নেড়েছে অথচ আমি তার জন্য দরজা খুলিনি? আমি আশার উৎস, তাহলে কী করে আশাকে আমার থেকে দূরে সরানো যায়? আমি কি গরিব যে বান্দা আমাকে কৃপণ হিসেবে পাবে? দুনিয়া, আখিরাত, দয়া, মায়া—সবই কি আমার কাছে নয়? আশান্বিতদের কিসে বাধা দেয় আমার প্রতি আশা করা থেকে? আমি যদি আসমান-জমিনের সকলকে একত্র করে প্রত্যেককে তা দিই—যা আমি সবাইকে একসাথে দিই—যদি আমি প্রত্যেকের আশা পূরণ করি, তাহলে আমার রাজত্ব থেকে অণু পরিমাণও কমবে না। এমন রাজত্ব কী করে কমতে পারে, যার ধারক আমি? ধ্বংস তাদের, যারা আমার দয়া থেকে নিরাশ হয়। ধ্বংস তাদের, যারা আমাকে অমান্য করে ও আমার নিষেধ করা সীমানায় পা বাড়ায়।'"

আল্লাহর কাছে চাওয়াকে তিনি ভালোবাসেন আর তাঁর কাছে না চাইলে তিনি রাগান্বিত হন। তিনি চান তাঁর বান্দারা তাঁর কাছে কামনা করুক, চেয়ে নিক, তাঁকে ডাকুক, তাঁর প্রতি নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশ করুক। তিনি তাদের ভালোবাসেন, যারা বিশুদ্ধচিত্তে ও ক্রমাগত দু'আ করে। মাখলুকের কাছে চাওয়া হলে সে রেগে যায়, কারণ সে অভাবগ্রস্ত ও অসমর্থ।

ইবনুস সাম্মাক ﵀ বলেন, "এমন কারও কাছে চেয়ো না, যে তোমার অনুরোধ না শুনে তোমার কাছ থেকে দৌড়ে পালাবে। বরং তাঁর কাছে যাও, যিনি তাঁর কাছে চাইতে আদেশ করেছেন।"

আবুল আতাহিয়্যাহ ﵀ বলেন,

আল্লাহ রাগান্বিত হন তাঁর কাছে না চাইলে,
বনী আদম রেগে যায় তার কাছে চাইলে।
আল্লাহর দিকেই ফেরাও তোমার যত দু'আ,
কারণ, তাঁর দিকেই আমাদের চূড়ান্ত যাওয়া।

ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায ﵀ বলতেন, "হে সেই সত্তা, যার কাছে না চাইলে রাগান্বিত হন! কেউ আপনার কাছে চাইলে তাকে যেন ফিরিয়ে দেবেন না।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের বলছেন তাঁর কাছে চাইতে। প্রতি রাতে তিনি ডাকেন, "কেউ কি আছে যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তাতে সাড়া দেবো?"[১৩১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, আমি তো নিকটেই। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে আহ্বান করে।"[১৩২]

বান্দা যে সময়েই তাঁকে ডাকুক না কেন, আল্লাহ শোনেন, নিকটে থাকেন, জবাব দেন। দুজনের মাঝে কোনো পর্দা থাকে না, দরজায় কোনো দারোগা থাকে না। কোনো মাখলুকের কাছে চাওয়া হলে বেশির ভাগ সময় সাথে সাথেই প্রাচীর উঁচু হয়ে ওঠে, দরজা বন্ধ হতে শুরু করে, আর সব রকমের বাধা দেখা দিতে শুরু করে।

আতা ﵀-কে তাউস ﵀ বলেন, "এমন কারও কাছে কিছু চাওয়া থেকে সাবধান থাকো, যে তোমার মুখের উপর দরজা আটকে দেবে আর বাধা খাড়া করে দেবে। বরং এমন কারও কাছে যাও, যার দরজা কিয়ামাত পর্যন্ত খোলা, যিনি তোমাকে আদেশ করেছেন তাঁর কাছে চাইতে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জবাব দেওয়ার।"[১৩৩]

একজন আলেমের উদ্দেশ্যে ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ ﵀ বলেছেন,

---

[১৩১] *বুখারি* : ১১৪৫-৬৩২১-৭৪৯৪ এবং *মুসলিম* : ৭৫৬ আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি ﷺ বলেন "প্রতিরাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের মহান প্রতিপালক শেষ আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, 'কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি জবাব দেবো? কেউ কি আছে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেবো? কেউ কি আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব?'"

[১৩২] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৬

[১৩৩] আবু নুয়াইম : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১; খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৪১

“আমার কাছে কি এই খবর পৌঁছেনি যে, আপনি রাজা ও রাজপুত্রদের কাছে ঘুরে বেড়ান আপনার জ্ঞান (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) নিয়ে? ধিক আপনাকে! আপনি এমন কারও কাছে যাচ্ছেন, যে আপনার মুখের উপর দরজা আটকে দেবে, নিজের বিত্তশালিতা গোপন করে গরিব সাজবে। অথচ আপনি তাকে ছেড়ে দিচ্ছেন, যার দরজা দিনে-রাতে খোলা থাকে আর তিনি তাঁর বিত্তশালিতা দেখিয়ে বলেন, ‘আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো।’”

একজন শাসকের দুয়ারে কয়েকজন লোককে জড়ো হতে দেখে মায়মুন ইবনু মিহরান ﷺ বলেছিলেন,

“সুলতানের মাধ্যমে যার প্রয়োজন পূরণ হয় না, সে জেনে রাখুক আর-রহমানের দরবারগুলো সব সময় খোলা। মাসজিদে গিয়ে দুই রাকআত সালাত পড়ে নিজের প্রয়োজনগুলো তাঁর কাছেই ব্যক্ত করো।”

বাকর আল-মুযানি ﷺ বলতেন, “হে আদমসন্তান, তোমার মতো আর কে আছে? তুমি যখনই চাও, তখনই পবিত্রতা অর্জন করে গোপনে তোমার প্রতিপালকের সাথে আলোচনা করতে পারো মাঝখানে কোনো পর্দা বা দোভাষী ছাড়াই।”

এক সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তি এসে অনুরোধ করল কোনো একজনের কাছে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য। তিনি জবাব দিলেন, “খোলা দরজা ফেলে আমি বন্ধ দরজার দিকে কখনোই যাব না।”

এ প্রসঙ্গে একজন সালাফ বলেছেন :

রাজার দুয়ার বন্ধ সকল,
আল্লাহর দুয়ার অনর্গল।

আরেকজন বলেছেন :

যাচকের থেকে পালিয়ে বেড়ানো
প্রহরী ঘেরা ব্যক্তিরা, শোনো।
আল্লাহর দুয়ারে প্রহরী নেই কোনো।

এক আলিমের উদ্দেশ্যে আরেকজন বলেছেন :

ঢুকতে দেবে না যে, বসতে হয় না তার দুয়ারে,
অথচ তুমি প্রয়োজন মেটাতে ডাকছ উহারে।

বাদ দাও তারে, চাও তার প্রতিপালকের কাছে,
পূরণ হয়ে যাবে তোমার যত প্রয়োজন আছে।

ইবনু আবিদ্দুনিয়া[১৩৪] ﵀ আবু উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবীজি ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, অমুক গোত্র আমাকে আক্রমণ করে আমার সন্তান ও উট নিয়ে গেছে।" নবীজি ﷺ জবাব দিলেন, "মুহাম্মাদের পরিবার এ রকম এ রকম জায়গায় থাকে, তাদের কাছে এক মুদ্দ বা সা (পরিমাপের দুটি একক) পরিমাণ খাবারও থাকে না। অতএব, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে চাও।" লোকটি ফিরে গেলে তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, "তিনি কী বলেছেন।" সে তা শোনালে স্ত্রী বলল, "কতই-না উত্তম জবাব!" অল্প কিছুদিন পরেই আল্লাহ তার সন্তান ও উট তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আরও এত পরিমাণ উট দিলেন, যা তার আগে ছিলই না। সে নবীজি ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে সব ঘটনা খুলে বলল। নবীজি ﷺ মিম্বরে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর লোকদের আদেশ দিলেন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে চাইতে ও তাঁরই উপর আশা রাখতে। তিনি তিলাওয়াত করলেন :

"যে তাকওয়া অবলম্বন করে, তিনি তার জন্য পথ করে দেবেন এবং তাকে তার কল্পনাতীত উৎস থেকে রিযক দেবেন।"[১৩৫]

সাবিত আল-বুনানিকে এক ব্যক্তি অনুরোধ করলেন তার হয়ে কাযির কাছে সুপারিশ করতে যাতে তার কিছু প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়া হয়। সাবিত তাঁর সাথে চললেন। পথে যত মাসজিদ পড়ল প্রতিটিতে ঢুকে তিনি সালাত পড়লেন ও দু'আ করলেন। তাঁরা আদালতে যখন পৌঁছলেন ততক্ষণে কাযি চলে গেছে। ওই লোকটি সাবিতকে এ জন্য দোষারোপ করতে লাগল। তিনি জবাবে বললেন, "এই পুরোটা সময় আমি তোমার অনুরোধের জবাব দিচ্ছিলাম।" পরে কাযির সাথে দেখা করা ছাড়াই আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দিলেন।

ইসহাক ইবনু উব্বাদ আল-বাসরি ﵀ ঘুমাচ্ছিলেন। স্বপ্নে এক লোককে তিনি বলতে দেখলেন, "অতি দুশ্চিন্তাগ্রস্তকে উদ্ধার করো।" তিনি জেগে উঠে বললেন, "প্রতিবেশীদের মাঝে কি কোনো অভাবগ্রস্ত আছে?" লোকেরা জবাব দিলো, "আমরা জানি না।" তিনি ঘুমিয়ে পড়লে দ্বিতীয়বারও একই স্বপ্ন দেখলেন। তৃতীয়বারে স্বপ্নের সেই ব্যক্তিটি বলল, "তুমি তার প্রয়োজন পূরণ না করে

---

[১৩৪] ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ* : পৃষ্ঠা ১০ এবং *আল-কানা'আহ ওয়াত তা'আফফুফ* : পৃষ্ঠা ৫৪; বায়হাকি, *আদ-দালাইল* : খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৭

[১৩৫] সূরাহ আত-তলাক, ৬৫ : ২

ঘুমাচ্ছ?" তিনি জেগে উঠে তিন শ দিরহাম সাথে নিয়ে খচ্চরে চরে বসরায় রওনা হলেন। তিনি সেখানে মাসজিদে থামলেন। সেখানে জানাযার সালাত হচ্ছিল। সেখানে তিনি এক ব্যক্তিকে সালাতরত দেখলেন। তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে সে সালাত শেষ করে তাঁর কাছে এল। ইসহাক বললেন, "হে আল্লাহর বান্দা, এই সময়ে তুমি মাসজিদে কী করছ?" সে বলল, "আমার মাত্র এক শ দিরহাম ছিল, যা আমি হারিয়ে ফেলেছি। এ ছাড়া আমার দুই শ দিরহাম দেনা আছে।" ইসহাক তাঁর টাকা বের করে বললেন, "এখানে তিন শ দিরহাম আছে। এটা নাও।" সে সেটা নিলে ইসহাক জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমাকে চেনো?" সে বলল, "না।" তিনি বললেন, "আমার নাম ইসহাক ইবনে উব্বাদ। আমি অমুক জায়গায় থাকি। তোমার কিছু লাগলে আমার কাছে এসো।" সে জবাব দিলো, "আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আমার কিছু লাগলে আমি তাঁকেই আগে ডাকব, যিনি আপনাকে এখানে নিয়ে এলেন।"

আব্দুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম ﷺ বলেন, "এক সকালে আমার মা আমার বাবাকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনার ঘরে খাওয়ার মতো এক টুকরা মাংসও নেই।' তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ওযু করে পোশাক গায়ে দিলেন এবং ঘরে সালাত আদায় করলেন। আমার মা আমাকে বললেন, 'তোমার বাবা এরচেয়ে বেশি কিছু করবে না। বরং তুমিই যাও।' আমি বের হলাম। আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল, যে খেজুর বিক্রি করত। আমি তার দোকানে গেলাম। সে আমাকে দেখে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল। আমি কিছু বলার আগেই সে নিজে থেকে ত্রিশ দিনার ভরা একটি থলি বের করে বলল, 'তোমার বাবাকে সালাম দিয়ো। জানিয়ো যে আমরা তাঁকে আমাদের ব্যবসার অংশীদার করেছি। এই হলো তাঁর শেয়ার।'"

ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﷺ এক যুদ্ধাভিযানে গেলেন কয়েকজন সহকর্মীসহ। তারা খরচ ভাগাভাগি করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ইবরাহীম ভাবতে লাগলেন কোন সহকর্মীর থেকে ধার নেওয়া যায়। হঠাৎ তিনি সংবিত ফিরে পেয়ে ভাবলেন, "ধিক আমাকে! আমি তাদের মনিবকে ভুলে মনিবের বান্দাদের কাছে চাইছি! অথচ মনিব আমাকে বলেন, 'আমার চেয়ে বেশি কে তোমার আবেদনের দাবিদার?'" তিনি ওযু করে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং সেজদায় বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, আপনি জানেন আমি কী করেছি। তা ভুলক্রমে অজ্ঞতাবশত হয়ে গেছে। আপনি যদি আমাকে শাস্তি দিতে চান, আমি তার যোগ্য। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে চান, আপনি তা করতে সক্ষম। আপনি আমার প্রয়োজন জানেন। আপনার রহমত দিয়ে তা পূরণ করে দিন।" তিনি মাথা তুলে নিজের

সামনে চার শ দিনার পড়ে থাকতে দেখলেন। সেখান থেকে তিনি এক দিনার নিয়ে চলে গেলেন।

আসবাগ ইবনু যাইদ ﷺ বলেন, "আমি এবং আমার সাথে থাকা লোকেরা তিন দিন কোনো কিছু না খেয়ে কাটালাম। আমার ছোট মেয়েরা আমার কাছে এসে কান্না করল, 'বাবা, ক্ষিদে পেয়েছে!' আমি ওযু করে সালাত আদায় করলাম এবং বিশেষ একটি দু'আ করার ইশারা পেলাম যার শেষ কথাগুলো ছিল, 'হে আল্লাহ, রিযকের দরজাগুলো আমার জন্য খুলে দিন। আমাকে কারও কাছে ঋণী রাখবেন না এবং আখিরাতে আপনার দয়ায় আমাকে এ জন্য দায়ী রাখবেন না, হে আরহামুর রাহিমীন!' আমি ঘরে ফিরতেই আমার বড় মেয়ে বলল, 'বাবা, আমাদের চাচা এসেছিলেন। তিনি এই দিরহামভর্তি থলে, এই ময়দাভর্তি বস্তা আর বাজারভর্তি এই বস্তা দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'ভাইজানকে আমার সালাম দিয়ো। আর বোলো কোনো কিছু লাগলে সেই দু'আটি করতে।'" আসবাগ ﷺ বলেন, "আল্লাহর কসম! আমার কোনো ভাই নেই। আমি জানিও না সেই লোকটি কে। কিন্তু আল্লাহ সর্বশক্তিমান।"

হাকাম ইবনু মূসা বলেন, "আমি এক সকালে ঘুম থেকে উঠতেই স্ত্রী অনুযোগ করল যে ঘরে কোনো ময়দা বা রুটি নেই। আমি কিছু পাব না জেনেই ঘর থেকে বের হলাম আর হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'হে আল্লাহ, আপনি জানেন আমার ঘরে কোনো ময়দা, রুটি বা টাকা নেই। অতএব আমাদের সেসব দিন।' এক ব্যক্তি আমার সাথে দেখা করে বলল, 'আপনার কী রুটি লাগবে, না ময়দা?' আমি বললাম, 'যেকোনোটি।' তারপর আমি সারা দিন আমার দরকারি জিনিস খুঁজতে ঘোরাঘুরি করলাম, কিন্তু কোথাও তা পেলাম না। আমি ফিরে এসে দেখলাম আমার পরিবারে রুটি আর মাংসের বিরাট আয়োজন চলছে। আমি বললাম, 'এসব কোথায় পেলে?' জবাব দিলো, 'আপনি যেই লোকটাকে পাঠালেন, তার কাছে।' আমি চুপ করে রইলাম।"

আওযায়ি ﷺ বলেন, "আমি তাওয়াফ করার সময় দেখলাম এক ব্যক্তি কাবার গিলাফ চড়িয়ে ধরে আছে আর বলছে, 'হে আল্লাহ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি গরিব। আমার সন্তানরা উলঙ্গ। আমার উট কৃশকায়। অতএব আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন, হে অদৃশ্য সর্বদ্রষ্টা!' একটি কণ্ঠ তার পেছন থেকে ডেকে বলল, 'আসিম, আসিম। তায়েফে তোমার চাচার ঘরে যাও। তিনি মারা গেছেন। তিনি এক হাজার ভেড়ি, তিন শ উট, চার শ দিরহাম, চারজন দাস ও তিনটি ইয়ামানি তরবারি রেখে গেছেন। গিয়ে সেগুলো গ্রহণ করো। কারণ, তুমি তার একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

আমি বললাম, 'আসিম, তুমি যার কাছে দু'আ করছিলে, তিনি নিকটেই ছিলেন।' সে বলল, আপনি কি আল্লাহর এই আয়াত পড়েননি :

"আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, আমি তো নিকটেই। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে আহ্বান করে।"[১৩৬]

এ সংক্রান্ত বর্ণনা ও ঘটনার পরিমাণ এত বেশি যে, সব বর্ণনা করতে গেলে এই রচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ ঘটনাগুলো যেসব কিতাবে পাওয়া যাবে তার কয়েকটি হলো : ইবনু আবিদ্দুনিয়া রচিত *আল-ফারাজ বাদুশশিদ্দাহ* ও *মুজাবিউদ্দাওয়াহ,* কাদি আবুল ওয়ালিদ ইবনু সাফফার রচিত *কিতাবুল মুস্তাসরিখিনা বিল্লাহি ইন্দা নুযুলিল বালা*, হাফিয আবুল কাসিম ইবনু বাশকওয়াল আল-আন্দালুসি রচিত *কিতাবুল মুস্তাগিসিনা বিল্লাহি ইন্দা নুযুলিল বালা* এবং যুহদ, অন্তর নরমকারী ও ইতিহাস-সংক্রান্ত অন্যান্য কিতাব।

শায়খ আবুল ফারাজ ইতিহাস-সংক্রান্ত তাঁর প্রধান রচনায় হাসান ইবনু সুফিয়ান আল-ফাসাওয়ির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাদীস লেখার উদ্দেশ্যে একদল সহকর্মীর সাথে মিসরে বসবাস করছিলেন। তাঁরা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ায় তাঁদের সহায়-সম্বল বেচে দিলেন। একসময় তাঁদের বিক্রি করার মতোও আর কিছু থাকল না। তিন দিন তাঁরা না খেয়ে কাটালেন। চতুর্থ দিন ঘুম থেকে উঠে তাঁরা প্রয়োজনের আতিশয্যে ভিক্ষা করতে মনস্থির করলেন। তাঁরা লটারি করলেন কে ভিক্ষা করতে যাবেন। হাসসান ইবনু সুফিয়ানের নাম উঠল। তিনি বললেন, "আমি দ্বিধান্বিত ও আতঙ্কিত হয়ে গেলাম। কিছুতেই ভিক্ষা করতে যেতে মন চাইছিল না। আমি মাসজিদে চলে গেলাম এবং দীর্ঘ করে দুই রাকআত সালাত পড়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ করলাম আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। আমি সালাত শেষ করার আগেই এক লোক তার দাসকে নিয়ে প্রবেশ করল, যে কাপড় বহন করছিল। সে বলল, 'এখানে হাসান ইবনু সুফিয়ান কে?' আমি সেজদা থেকে মাথা তুলে বললাম, 'আমি।' সে বলল, 'আমির বিন তুলুন আপনাকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আপনার অধিকার যথাসময়ে পূরণ না করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। আপনার খরচ বহনের জন্য যা কিছু লাগবে, তা তিনি পাঠিয়েছেন। তিনি নিজেই আগামীকাল আপনার সাথে দেখা করতে আসবেন এবং দুঃখপ্রকাশ করবেন।' সে আমাদের প্রত্যেকের হাতে এক শ দিরহামভর্তি একেকটি থলি গছিয়ে দিলো। আমরা চরম বিস্মিত হয়ে ছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী করে ঘটল? সে উত্তর দিলো, 'তিনি রাতে ঘুমন্ত

[১৩৬] আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৬

অবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন আকাশ থেকে এক ঘোড়সওয়ার ঘোষণা করছে, 'উঠে অমুক মাসজিদে হাসান ইবনু সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে যাও। তাঁরা তিন দিন না খেয়ে আছেন।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?' জবাব এল, 'আমি রিদওয়ান, জান্নাতের প্রহরী।'" হাসান বলেন, "আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলাম, নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম এবং সে রাতেই মিসর ত্যাগ করলাম এই ভয়ে যে, সত্যিই শাসক আমাদের সাথে দেখা করতে চলে আসবেন। সে ক্ষেত্রে আমরা তাঁর কাছ থেকে খ্যাতি পেয়ে যেতাম, ফলে আমাদের মধ্যে আড়ম্বর চলে আসত।"

আবুল ফারাজ এ ছাড়াও মুহাম্মাদ ইবনু হারুন আর-রুওইয়ানির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এবং মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযি, মুহাম্মাদ ইবনু 'উলওয়াইহ আল-ওয়াররাক, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ সকলে একত্রে দেখা করলেন। তিনি উপরে বর্ণিত একই কাহিনি বললেন এবং জানালেন যে, দু'আকারী ছিলেন ইবনু খুযাইমাহ। আরেক বর্ণনাসূত্রে এসেছে যে, তাঁরা চারজন ছিলেন। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ ইবনু জারির, মুহাম্মাদ ইবনু নাসর, মুহাম্মাদ ইবনু খুযাইমাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনু হারুন।

অধ্যায় ছয়
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া

রাসূল ﷺ বলেন, "যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে।" আল্লাহর হেফাজত করা আর স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে জানার আদেশ দেওয়ার পর তিনি আমাদের ইবাদাতের সারনির্যাসের কথা বলছেন। তা হলো শুধু আল্লাহর কাছেই দু'আ করা। নু'মান বিন বাশির ؓ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দু'আ হলো ইবাদাত।" তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন,

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো।'"[১৩৭]

এ ছাড়া চারটি সুনান গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[১৩৮]

এই সকল আদেশের পর তিনি আমাদের এক আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এই নির্দেশ উৎসারিত হয়েছে আল্লাহর এই আয়াত থেকে :

"আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।"[১৩৯]

এর মাধ্যমে এক ব্যাপক-বিস্তৃত মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, সকল আসমানি কিতাবের মূল বার্তা এই মূলনীতিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

শুধুই আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার দুটি তাৎপর্য রয়েছে :

১. আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য করা বান্দার পক্ষে সম্ভব না।

২. আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ছাড়া আর কেউই বান্দাকে তার দুনিয়াবি ও আখিরাতি জীবনের উন্নতির জন্য সাহায্য করতে পারে না। যাকে আল্লাহ

---

[১৩৭] সূরাহ গাফির, ৪০ : ৬০

[১৩৮] আবু দাউদ : ১৪৭৯; তিরমিযি : ২৯৬৯-৩২৪৭-৩৩৭২; নাসাঈ, *আল-কুবরা* : ১১৪৬৪; ইবনু মাজাহ : ৩৮২৮
তিরমিযি একে হাসান সহীহ বলেছেন। নববী, *আল-আযকার* : ৪৭৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন এর ইসনাদ হাসান; ইবনু হাজার, *ফাতহ* : খণ্ড ১, ৬৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, এর ইসনাদ জাইয়্যিদ; ইবনু হিব্বান : ২৩৯৬ একে সহীহ বলেছেন; একই কথা বলেছেন হাকিম : ১৯০২; যাহাবি একমত। আলবানি, *সহীহুত তারগীব* : ১৬২৭, একে সহীহ বলেছেন।

[১৩৯] সূরাহ আল-ফাতিহাহ, ১ : ৫

> সাহায্য করেন, সে প্রকৃত অর্থেই সাহায্যপ্রাপ্ত; আর যাকে আল্লাহ পরিত্যাগ করেন, সে সত্যিকার অর্থেই পরিত্যক্ত।

এক সহীহ হাদীসে এসেছে, নবীজি ﷺ বলেছেন, "তোমার উপকারে আসবে এমন সকল জিনিস কামনা করো এবং আল্লাহর সাহায্য চাও। আর নিরাশ হোয়ো না।"[১৪০]

তিনি ﷺ এ কথাটি খুতবায় বলতেন ও সাহাবাগণকে বলতে শিক্ষা দিতেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছে হিদায়াত কামনা করি..."[১৪১]

তিনি মুয়ায ﷺ-কে শিখিয়েছেন তিনি যেন প্রত্যেক সালাতের পর এ দু'আ করেন,

> "হে আল্লাহ, আপনাকে স্মরণ করতে, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে ও আপনার জন্য আমার ইবাদাতকে সুন্দর করতে আমাকে সাহায্য করুন।"[১৪২]

নবীজি ﷺ-এর একটি দু'আ এমন ছিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সাহায্য করুন। আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না।"[১৪৩]

উমার ﷺ-এর নির্ধারিত দু'আ কুনুতের একটি অংশ হলো, "হে আল্লাহ, আমরা আপনার সাহায্য চাই।"[১৪৪]

---

[১৪০] *মুসলিম* : ২৬৬৪; আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত।

[১৪১] শাফিঈ, *মুসনাদ* : খণ্ড ১, ১৪৭ পৃষ্ঠায় ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে যঈফ জিন্দান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, খুতবাটি "তাঁর হিদায়াত কামনা করো" অংশটি ছাড়া *সহীহ মুসলিমে* এসেছে।

[১৪২] আহমাদ : ২২১১৯-২২১২৬; আবু দাউদ : ১৫২২; নাসাঈ : ১৩০৪ এবং *আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ* : ১০৯
নববী, *আল-আযকার* : পৃষ্ঠা ১০৩ এবং *আল-খুলাসাহ* : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬৮ এবং রিয়াদ : ৩৮৯-১৪৩০ এ বলেন এর ইসনাদ সহীহ। একই কথা বলেছেন ইবনু কাসির, *আল-বিদায়া* : খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯৭; ইবনু আল্লান, *আল-ফুতুহাতুর রব্বানিয়্যাহ* : খণ্ড ৩, ৫৫ পৃষ্ঠাতে ইবনু হাজারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এটি সহীহ। আলবানি, *সহীহুত তারগীব* : ১৫৯৬-এ একে সহীহ বলেছেন, আরনাউত একই কথা বলেছেন।

[১৪৩] আহমাদ : ১৯৯৭; আবু দাউদ : ১৫১০-১৫১১; তিরমিযি : ৩৫৫১, তিরমিযি একে হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনু হিব্বান : ৯৪৮ ও হাকিম : ১৯১০ একে সহীহ বলেছেন, যাহাবি একমত। আলবানি *সহীহুত তিরমিযিতে* একে সহীহ বলেছেন। আরনাউত বলেছেন এর ইসনাদ সহীহ।

[১৪৪] তাহাবি, *মা'আনিউল আসার* : খণ্ড ১, ২৫০ পৃষ্ঠায় জাইয়্যিদ ইসনাদ সহকার বর্ণনা করেছেন।

এক বিখ্যাত বর্ণনায় আছে, সাগর দ্বিখণ্ডিত করার জন্য আঘাত করে মূসা ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ, সব প্রশংসা আপনার। আপনার কাছেই অভিযোগ করা হয়। আপনিই সেই সত্তা, যার সাহায্য কামনা করা হয়। আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করা হয় মুক্তির জন্য, আপনার প্রতিই আস্থা রাখা হয় এবং আপনি ছাড়া আর কারও শক্তি বা গতি নেই।"[১৪৫]

আল্লাহর আদেশ পালন, আল্লাহর নিষেধকৃত বস্তু পরিত্যাগ এবং তাকদিরের ভালোমন্দ মেনে নেওয়া বান্দার পক্ষে কখনোই সম্ভব না আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। ইয়াকুব ﷺ বলেন,

"...আমি উত্তম ধৈর্যধারণ করব। তোমরা যা বানিয়েছ, তার ব্যাপারে আল্লাহই আমার আশ্রয়স্থল।"[১৪৬]

এ কারণেই নিজের উপর মিথ্যে অপবাদ আরোপের খবর (ইফকের ঘটনা) শুনে আয়িশা ﷺ এই কথাটি বলেছেন। পরে আল্লাহ্ তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেন।

মূসা ﷺ তাঁর জাতিকে বলেছিলেন :

"অতএব আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো।"[১৪৭]

আল্লাহ্ বলেন :

"(রাসূল) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায্য মীমাংসা করে দাও, আর আমাদের প্রতিপালক তো দয়ার আধার। তোমরা যেসব কথা বলছ, সে বিষয়ে তিনিই একমাত্র আশ্রয়স্থল।'"[১৪৮]

নবীজি ﷺ যখন উসমান ﷺ-কে সুসংবাদ দিলেন যে তিনি ফিতনার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন উসমান ﷺ বলেছিলেন, "আল্লাহর সাহায্য চাই।"[১৪৯] ফিতনাবাজরা যখন ভেতরে ঢুকে উসমান ﷺ-কে মারতে লাগল আর তাঁর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল, তখন তিনি পড়ছিলেন, "(হে

---

[১৪৫] তাবারানি, *আল-আসওয়াত*, *আস-সগীর*, ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত; হায়সামি : খণ্ড ১০, ১৮৩ পৃষ্ঠাতে বলেছেন, "এর ইসনাদে থাকা বর্ণনাকারীদের আমি চিনি না"।

[১৪৬] সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ১৮

[১৪৭] সূরাহ আল-আ'রাফ, ৭ : ১২৮

[১৪৮] সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ১১২

[১৪৯] *মুসলিম* : ২৪০৩

আল্লাহ) আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আপনি মহাপবিত্র। নিশ্চয়ই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত (ইউনুস ﷺ-এর সেই দু'আ)। হে আল্লাহ, তাদের বিরুদ্ধে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে যা দিয়ে পরীক্ষা করছেন, তা সহ্য করার জন্য আমি আপনার কাছে সাহায্য চাই।"

আবু তালহা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে বললেন, "হে বিচারদিবসের মালিক, আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই।" আবু তালহা ﷺ বলেন, "আমি দেখলাম শত্রুরা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে।" আবুশ শাইখ আল-আসবাহানি এটি বর্ণনা করেছেন।[১৫০]

দ্বীনি ও দুনিয়াবি জীবনে ভালো করার জন্য বান্দার আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। যুবাইর ﷺ তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি শেষ উপদেশে বলেন, তাঁর ঋণগুলো যেন শোধ করে দেওয়া হয়। তারপর বলেন, "যদি তা করতে অসমর্থ হও, আমার মনিবের কাছে সাহায্য চেয়ো।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, আপনার মনিব কে?" তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ।" আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখনই ঋণ পরিশোধ করতে কষ্ট হতো, আমি বলতাম, 'হে যুবাইরের মনিব, তাঁর ঋণ শোধ করে দিন।' আর তা শোধ করার ব্যবস্থা হয়ে যেত।"

মিম্বর থেকে দেওয়া নিজের প্রথম খুতবায় উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, "আরবরা এক দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্ত উট[১৫১], যার রশি আমি ধরেছি। আমি একে নিয়ে বিস্তীর্ণ ভূমি পার হব আর এ কাজে আমি আল্লাহর সাহায্য চাই।"

মৃত্যু থেকে শুরু করে কিয়ামাতের সকল ভয়াবহতা সহ্য করার জন্যও বান্দা আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ যখন মৃত্যুশয্যায়, তাঁর পাশে থাকা এক লোক বলল, "এটি (মৃত্যু) ভয়াবহ রকমের কঠিন।" খালিদ ﷺ বললেন, "নিশ্চয়। কিন্তু আমি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সাহায্য চাই।"

---

[১৫০] তাবারানি, *আল-আসওয়াত* : ৮১৬৩; ইবনুস সুন্নি, *আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ* : ৩৩৪; হায়সামি : খণ্ড ৫, ৩২৮ পৃষ্ঠায় বলেন, এর ইসনাদে আব্দুস সালাম ইবনু হাশিম আছেন, যিনি যঈফ। আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ৫১০৫-এ একে যঈফ বলেছেন।

[১৫১] অর্থাৎ, যেকোনো কষ্ট সহ্য করে নেয় এবং যা করা উচিত তা করে।

আমির বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ﷺ মৃত্যুশয্যায় কান্না করে বলেন, "আমি কান্না করছি কেবল দিনের উত্তাপ (সিয়াম) আর দাঁড়ানোর শৈত্য (তাহাজ্জুদ) হারিয়ে ফেলার কারণে। আমি এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই।"

অতীতের এক ব্যক্তি বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার অবাক লাগে, যে আপনাকে জানে সে কী করে অন্য কারও প্রতি আশা রাখতে পারে? আমার অবাক লাগে, যে আপনাকে জানে সে কী করে অন্য কারও কাছে সাহায্য চাইতে পারে?"

উমার বিন আব্দুল আযিয ﷺ-কে আল-হাসান ﷺ চিঠি লেখেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কারও সাহায্য চাইবেন না। না হলে যার কাছে সাহায্য চাচ্ছেন আল্লাহ আপনাকে তার দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন।"

একজন সালাফ বলেছিলেন, "আল্লাহর সাহায্য চাও। তাঁর সাহায্য চাও, কারণ যাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় তাদের মাঝে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

অধ্যায় সাত

কলম শুকিয়ে গেছে

নবীজি ﷺ বলেন, "যা যা ঘটবে, (তা লেখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে।" আরেক বর্ণনায় আছে, "কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে।" আরেক বর্ণনায় আছে, "কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে।"

এই সবগুলো 'কিনায়াহ' বা রূপক দিয়ে তাকদীরের কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে। সবকিছুই আগে থেকে এক বিস্তীর্ণ কিতাবে লিখিত রয়েছে। এমন এক বইয়ের কথা বলা হচ্ছে, যা সুদীর্ঘকাল আগে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতে লেখার কাজে ব্যবহৃত কলমটি তুলে নেওয়া হয়েছে, কলম বা পৃষ্ঠার কালি শুকিয়ে গেছে, আর মোছা যাবে না। তাকদীরের গভীরতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য এ এক চমৎকার পদ্ধতি।

কুরআন ও সুন্নাহও এই অর্থের দিকে নির্দেশ করে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন :

> **"পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোনো বিপদ আসে না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। এটি (করা) আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।"[১৫২]**

দাহহাক ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "আল্লাহ কলম সৃষ্টি করে তাঁর নির্দেশে একে চলতে বললেন। কলমটির আকৃতি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। কলম বলল, 'হে প্রতিপালক, কী লিখব?' তিনি বললেন, 'আমি যা কিছু সৃষ্টি করব এবং আমার সৃষ্টির সাথে যা যা হবে–বৃষ্টি, উদ্ভিদ, আত্মা, কর্ম, রিযক ও আয়ু।' কিয়ামাত পর্যন্ত যা যা ঘটবে, কলম তা লিখল। আল্লাহর কাছে তাঁর আরশের নিচে তিনি তা এক কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছেন।"

আবু যাবইয়ান থেকে বর্ণিত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করলেন ও তাকে আদেশ দিলেন, 'লেখো।' এটি জিজ্ঞেস করল, 'কী লিখব?' তিনি জবাব দিলেন, 'তাকদীর।' কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত যা যা

---

১৫২ সূরাহ আল-হাদীদ, ৫৭ : ২২

ঘটবে, সেটি সেসব লিপিবদ্ধ করল।" তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন:

"নূন। কলমের ও তারা যা লেখে, তার শপথ।"[১৫৩]

আবুদ্দুহা ﷺ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে একই রকম একটি বর্ণনা করেন।[১৫৪] আবুদ্দুহা ﷺ-এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীসও আছে, তবে তা সহীহ নয়।[১৫৫]

ইবনে বাত্তাহ ﷺ থেকে দুর্বল ইসনাদে আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ্ প্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন। তারপর সৃষ্টি করেছেন আন-নূন, যা হলো একটি কালির দোয়াত। তিনি আদেশ করলেন, 'লেখো।' এটি জিজ্ঞেস করল, 'কী লিখব?' তিনি বললেন, 'কিয়ামাত পর্যন্ত যা যা ঘটবে, লেখো।' এটি হলো আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লার এই আয়াতের অর্থ :

"নূন। কলমের ও তারা যা লেখে, তার শপথ।"[১৫৬]

এরপর কলমকে এমনভাবে সিলগালা করা হলো যে, তা আর কথা বলতে পারে না। কিয়ামাত পর্যন্ত এটি আর কথা বলবে না।"[১৫৭]

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযির সূত্রে উবাদা ইবনুস সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত আছে নবীজি ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, যাকে

---

[১৫৩] সূরাহ আল-কলাম, ৬৮ : ১-২
বর্ণনাটি তাবারিতে (৬৮ : ১-এর তাফসিরে) এবং আজুররি, *আশ-শরিয়াহ* : ১৮৩-৩৫০-তে সহীহ্ ইসনাদ সহকারে আছে। হাকিম : ৩৮৪০ একে সহীহ্ বলেছেন, যাহাবি একমত।
[১৫৪] প্রাগুক্ত, আজুররি : ১৮২ এবং এটি সহীহ্।
[১৫৫] তাবারানি, *আল-কাবির* : ১২২২৭; বর্ণনাসূত্র যঈফ, যেহেতু এতে মুয়াম্মাল ইবনু ইসমাঈল আছেন, যিনি সত্যবাদী, কিন্তু দুর্বল স্মরণশক্তিধারী। হায়সামি : খণ্ড ৭, ১২৮ পৃষ্ঠায় বলেন, "মুয়াম্মাল বিশ্বস্ত, কিন্তু ভুল করেন। ইবনু মাইন ও অন্যান্যরা তাঁকে সিকাহ বলেছেন। *বুখারি* ও অন্যান্যরা বলেছেন যঈফ।"
[১৫৬] সূরাহ আল-কলাম, ৬৮ : ১-২; বর্ণনাটি তাবারি : খণ্ড ২৯, ৯-১০ পৃষ্ঠায় আছে।
[১৫৭] ইবনু বাত্তাহ, *আল-ইবানাহ (কাদর)* : ১৩৬৪; আজুররি : ১৭৯-৩৪৫; সুয়ুতি, *আল-লাই আল-মাসনুয়াহ* : খণ্ড ১, ১৩১ পৃষ্ঠায় একে হাকিম আত-তিরমিযির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটি আরও বর্ণনা করেছেন ইবনু আসাকির, *তারিখুদ্দিমাশক* : খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ২৪৭
ইবনু আদি, *আল-কামিল* : খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৫২২, হাদীস নং ১৭৫৩-তে বলেছেন হাদীসটি বাতিল ও মুনকার। যাহাবি, *আল-মিযান* : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬১, হাদীস নং ৮২৯৮-এ একমত পোষণ করেছেন। একই কথা বলেছেন আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ১২৫৩

তিনি আদেশ দিয়েছেন, 'লেখো।' সে সময় সেটি সেই সবকিছু লিখল, যা কিয়ামাত পর্যন্ত ঘটবে।"[১৫৮]

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে নবীজি ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রতিটি প্রাণীর তাকদীর আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছেন।"[১৫৯]

ইমাম আহমাদ, তিরমিযি ও নাসাঈর সূত্রে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেন,

> "নবীজি ﷺ দুটি বই নিয়ে আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা কি জানো এই বইগুলো কী?' আমরা বললাম, 'না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। যদি না আপনি আমাদের জানান।' তিনি ডান হাতের বইটি দেখিয়ে বললেন, 'এটি রব্বুল আ'লামিনের পক্ষ থেকে আসা একটি কিতাব, যাতে সকল জান্নাতির নাম, তাদের পিতামাতার নাম, গোত্রের নাম (বিস্তারিত) লিখিত রয়েছে। একদম শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত লিখিত রয়েছে। এটি সংখ্যায় না কমবে, না বাড়বে।' বাম হাতের বইটির ব্যাপারে বললেন, 'এটি রব্বুল আ'লামিনের পক্ষ থেকে আসা একটি কিতাব, যাতে সকল জাহান্নামির নাম, তাদের পিতামাতার নাম, গোত্রের নাম (বিস্তারিত) লিখিত রয়েছে। একদম শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত লিখিত রয়েছে। এটি সংখ্যায় না কমবে, না বাড়বে।' সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, যদি সব নির্ধারিত হয়েই থাকে, তাহলে আমল করার কী দরকার?' তিনি বললেন, 'দৃঢ়, অবিচল ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকো। জান্নাতি ব্যক্তির সর্বশেষ কাজ হবে জান্নাতিদের কাজের মতো, এর আগে সে যা-ই করে থাকুক না কেন। জাহান্নামি ব্যক্তির সর্বশেষ কাজ হবে জাহান্নামিদের কাজের মতো, এর আগে সে যা-ই করে থাকুক না কেন। বই দুটি ফেলে আল্লাহর রাসূল ﷺ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'তোমাদের প্রতিপালক বান্দাদের ব্যাপারে সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, এক দল যাবে জান্নাতে, আরেক দল যাবে জাহান্নামে।'[১৬০]"[১৬১]

---

[১৫৮] আহমাদ : ২২৭০৫-২২৭০৭; আবু দাউদ : ৪৭০০; তিরমিযি : ২১৫৫-৩৩১৯; তিরমিযি একে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুরআন* : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৫ এবং আলবানি, *সহীহাহ* : ১৩৩ এবং আরনাউত একে সহীহ বলেছেন।

[১৫৯] মুসলিম : ২৬৫৩

[১৬০] সূরাহ আশ-শুরা, ৪২ : ৭

[১৬১] আহমাদ : ৬৫৬৩; তিরমিযি : ২১৪১; নাসাঈ, *আল-কুবরা* : ১১৪০৯; তিরমিযি একে হাসান সহীহ গারীব এবং নাসাঈ সহীহ বলেছেন, যা বর্ণিত আছে *তুহফাতুল আশরাফ* : খণ্ড ৬,

ইমাম আহমাদ ﷺ-এর সূত্রে আবুদ্দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> “প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহ পাঁচটি বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন– তার আয়ু, তার রিযক, তার আমল এবং সে কি ধ্বংসপ্রাপ্ত না নাজাতপ্রাপ্ত।”[১৬২]

ইমাম আহমাদ ও তিরমিযির সূত্রে ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণ সৃষ্টি করেছেন এবং নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার আয়ু, তার রিযক এবং যেসব ফিতনার সে মুখোমুখি হবে।”[১৬৩]

সহীহ মুসলিমে জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল,

> “হে আল্লাহর রাসূল, আজকের আমল কী উদ্দেশ্যে করা হবে? কলম শুকিয়ে গেছে ও তাকদীর নির্ধারিত হয়ে গেছে, সেই উদ্দেশ্যে; নাকি ভবিষ্যতের কোনো কিছুর জন্যে?” রাসূল ﷺ বললেন, “বরং কলম শুকিয়ে গেছে ও তাকদীর নির্ধারিত হয়ে গেছে, সেই উদ্দেশ্যে।” সেই ব্যক্তি বলল, “তাহলে আমল করব কী জন্যে?” তিনি ﷺ বললেন, “আমল করতে থাকো। কারণ, প্রত্যেকের জন্য (সে যেই আমলের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, তা) সহজ করে দেওয়া হয়।”[১৬৪]

---

২৪৩ পৃষ্ঠায়। ইবনু হাজার, *ফাতহ*: খণ্ড ৬, ৩৩৬ পৃষ্ঠায় এর ইসনাদ হাসান বলেছেন। অনুরূপ বলেছেন আলবানি, *আস-সহীহাহ*: ৮৪৮

[১৬২] আহমাদ : ২১৭২২ এই শব্দ সহকারে, “আল্লাহ প্রত্যেক বান্দার জন্য পাঁচটি বিষয় নির্ধারিত করে দিয়েছেন–তার আয়ু, তার আমল, তার বিশ্রাম, তার নড়াচড়া এবং তার রিযক।” ইবনু হিব্বান : ৬১৫০-এ একে সহীহ বলেছেন। আহমাদ : ২১৭২৩-এ শব্দগুলো, “আল্লাহ প্রত্যেক বান্দার জন্য পাঁচটি বিষয় নির্ধারিত করে দিয়েছেন–তার আয়ু, তার রিযক, তার আমল, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত না নাজাতপ্রাপ্ত।” সুয়ুতি, *আল-জামিউস সগীর*: ৫৮৪৮-এ একে সহীহ বলেছেন। অনুরূপ বলেছেন ওয়াদি, *আস-সহীহুল মুসনাদ*: ১০৪৫, আলবানি, *যিলালুল জান্নাহ*: ৩০৭-৩০৮ এবং আরনাউত, উভয়ে একে সহীহ বলেছেন।

[১৬৩] আহমাদ : ৪১৯৭; তিরমিযি : ২১৪৩; আলবানি, *আস-সহীহাহ*: ১১৫২ এবং আরনাউত একে সহীহ বলেছেন। আহমাদ : ৮৩৪৩-এ আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আল্লাহ প্রতিটি আত্মা সৃষ্টি করে এর জীবন, মরণ, এটি যেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হবে এবং রিযক নির্ধারিত করে দিয়েছেন।” ইবনু হিব্বান : ৬১১৮-৬১১৯ এবং আরনাউত একে সহীহ বলেছেন।

[১৬৪] মুসলিম : ২৬৪৮

এ সংক্রান্ত হাদীস ও সাহাবাগণের বর্ণনা প্রচুর রয়েছে। একজন বলেছেন :

আমল করতে থাকো পুরোটা,
ঘটিতব্য সকল লিখে কলম গেছে শুকিয়ে,
মানুষের রয়েছে এমনই স্রষ্টা,
যার নির্ধারণ থেকে কেউ যাবে না পালিয়ে।

অধ্যায় আট
আল্লাহর নির্ধারণই কার্যকর হয়

নবীজি ﷺ বলেছেন, "সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একত্র হয়ে যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না।"

এর অর্থ হলো, বান্দা যত উপকার ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সবই তার জন্য আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ মিলে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও অনির্ধারিত কোনো বিষয়ের মুখোমুখি তাকে করতে পারবে না। কুরআনের আয়াতেও এটি প্রমাণিত হয়। যেমন :

> **"বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের ঘটবে না..."**[১৬৫]

> **"পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোনো বিপদ আসে না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখিনি।..."**[১৬৬]

> **"...বলে দাও, যদি তোমরা তোমাদের ঘরেও থাকতে, তথাপি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত ছিল, তারা তাদের মৃত্যুর স্থানের পানে বেরিয়েই পড়ত..."**[১৬৭]

ইমাম আহমাদের সূত্রে আবুদ্দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "সবকিছুরই একটি হাকিকত রয়েছে। বান্দা ততক্ষণ ঈমানের হাকিকত অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জেনে নিচ্ছে যে, তার সাথে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল; যা ঘটেনি, তা কিছুতেই ঘটত না।"[১৬৮]

---

[১৬৫] সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ৫১

[১৬৬] সূরাহ আল-হাদীদ, ৫৭ : ২২

[১৬৭] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১৫৪

[১৬৮] আহমাদ : ২৭৪৯০; ইবনু আবি আসিম : ২৪৬; একে হাসান বলেছেন, সুয়ুতি, *আল-জামি* : ২৪১৭ এবং ওয়াদিঈ, *সহীহুল মুসনাদ* : ১০৫০। আলবানি, *যিলালুল জান্নাহ* : ২৪৬ এবং *আস-সহীহাহ* : ২৪৭১-এ একে সমর্থনকারী হাদীসের কারণে সহীহ বলেছেন।

আবু দাঊদ ও ইবনে মাজাহর সূত্রেও যায়েদ বিন সাবিত ﵁ থেকে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১৬৯]

জেনে রাখুন, ইবনে আব্বাস ﵄-কে দেওয়া পুরো উপদেশটি এই কেন্দ্রীয় মূলনীতিকে ঘিরেই আবর্তিত হয় এবং এরই শাখা হিসেবে বের হয়। বান্দা যখন উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা ভালো-মন্দ ও উপকার-অপকার ছাড়া আর কিছুই তার সাথে ঘটবে না, পুরো সৃষ্টিজগৎ মিলে এর অন্যথা করতে চাইলেও ব্যর্থ হবে, সে তখন বুঝতে পারবে যে এক আল্লাহই উপকার করার ও ক্ষতি করার মালিক, তিনিই দেন, তিনিই দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লার প্রতি বান্দার তাওহীদ পূর্ণাঙ্গতা পাবে। সে তখন একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চাইবে, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবে, তাঁর সামনেই নিজেকে বিনীত ও অবনত করবে। সে শুধু তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাইবে। কারণ, কারও উপাসনা করা হয়ই এই আশায় যে, উপাস্য কোনো উপকার করবেন এবং কোনো অপকার থেকে বাঁচাবেন। এ জন্যই আল্লাহ্ অন্য কোনো কিছুর উপাসনা নিষিদ্ধ করেছেন যে, তারা কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না, তাদের উপাসনা নিষ্ফল।[১৭০]

---

[১৬৯] আহমাদ : ২১৫৮৯-২১৬১১-২১৬৫৩; আবু দাঊদ : ৪৬৯৯; ইবনু মাজাহ : ৭৭ এই শব্দ সহকারে, "তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পরিমাণ খরচ করো, তাহলেও আল্লাহ তা কবুল করবেন না, যদি না তুমি তাকদিরে বিশ্বাস করো এবং জেনে নাও যে, যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে তা হওয়ারই ছিল এবং যা আপতিত হয়নি তা কিছুতেই হওয়ার ছিল না। এ (বিশ্বাস) ছাড়া অন্য কোনো কিছুর উপর মৃত্যুবরণ করলে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" একে সহীহ বলেছেন ইবনু হিব্বান : ৭২৭ এবং আলবানি, *তাখরিজ আবু দাঊদ* : ৪৬৯৯; আরনাউত বলেছেন এর ইসনাদ শক্তিশালী। তিরমিযি : ২১৪৪ এবং তাবারানি, *আল-কাবির* : ১১২৪৩ ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "বান্দা ততক্ষণ মুমিন হবে না যতক্ষণ না সে তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করে এবং জেনে নেয় যে, যা তার উপর আপতিত হয়েছে তা হওয়ারই ছিল এবং যা আপতিত হয়নি তা কিছুতেই হওয়ার ছিল না।" আলবানি, *আস-সহীহাহ*: ২৪৩৯ একে সহীহ বলেছেন।

[১৭০] যেমন আল্লাহর কালাম, "তারা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদাত করে এমন কিছুর, যা না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে আর না উপকার করতে পারে।" [সূরাহ ইউনুস, ১০ : ১৮] "তারপরও তারা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদাত করে এমন কিছুর, যা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না ক্ষতি।" [সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৫৫] "বাবা, কেন আপনি এমন জিনিসের ইবাদাত করেন যা শোনে না, দেখে না, আপনার কোনো কাজেই আসে না?" [সূরাহ মারইয়াম, ১৯ : ৪২] "আর তারা তাঁকে বাদ দিয়ে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে অন্য কিছুকে, যারা কিছুই সৃষ্ট করে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের ক্ষতি বা উপকার করার, আর ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের উপর।" [সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৩]

যাদের অন্তরে ঈমান ঠিকমতো প্রবেশ করেনি, তারা স্রষ্টার আনুগত্যের আগে সৃষ্টির আনুগত্যকে স্থান দেয় এই ভেবে যে, এগুলো তার কিছু উপকার করবে বা কিছু ক্ষতি থেকে তাকে বাঁচাবে। বান্দা যখন উপলব্ধি করবে যে, একমাত্র আল্লাহই লাভ-ক্ষতি করানোর মালিক, তিনিই দাতা, তিনিই দান থেকে বিরতকারী, তখন বান্দা ইবাদাতের জন্য আল্লাহকেই নির্দিষ্ট করে নেবে এবং সৃষ্টির উপর স্রষ্টাকে প্রাধান্য দেবে। সাহায্য চাওয়ার জন্যও তখন এক আল্লাহরই কাছে শরণাপন্ন হবে।

এই ব্যাপক অর্থপূর্ণ ও অসাধারণ উপদেশে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যার প্রতিটিই পর্বতপ্রমাণ গুরুত্বের দাবিদার।

বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে হেফাজত করার অর্থ হলো আল্লাহর দেওয়া সীমা মেনে চলা এবং তাঁর অধিকারসমূহ আদায় করা। এটিই তাঁর ইবাদাতের হাকিকত। এর মাধ্যমে উপদেশটি শুরু হয়। তারপর তা এগিয়ে যায় আল্লাহ কর্তৃক বান্দার হেফাজতের দিকে, যার বাস্তবায়ন প্রতিটি বান্দার চূড়ান্ত মনোবাসনা।

এরপর বলা হয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বান্দা আল্লাহকে জানলে আল্লাহ তাকে তার দুঃখ-দুর্দশার সময় জানবেন। এটি হলো আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে হেফাজত করার অংশ এবং এর পূর্ণতা দানকারী। দুঃখ-কষ্টের সময়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো এটাই সেই সময় যখন বান্দা এমন সত্তার কাছে মরিয়া হয়ে ফিরে যায়, যে তার সম্পর্কে জানে এবং তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে। এমনকি মুশরিকরাও এ রকম সময় এক আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা, কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। জানে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই কেবল তাদের দু'আর উত্তর প্রদানে সক্ষম। কিন্তু যখন বিপদ কেটে যায়, তারা শির্কে ফিরে যায়—যার কথা আল্লাহ কুরআনে বহু জায়গায় বলেছেন এবং যার কারণে মুশরিকদের নিন্দা করেছেন।[১৭১] এই উপদেশের মাধ্যমে নবীজি ﷺ

---

[১৭১] যেমন আল্লাহর বাণী, "যখন মানুষকে দুঃখ-ক্লেশ স্পর্শ করে, সে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। আর যখন আমি সে দুঃখ-ক্লেশ অপসারণ করে দিই, সে এমনভাবে চলে যায় যেন তাকে দুঃখ-ক্লেশ স্পর্শ করার পর সে আমাকে কখনো ডাকেইনি।" [সূরাহ ইউনুস, ১০ : ১২] "তোমরা যে অনুগ্রহই লাভ করে থাকো, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যখন দুঃখ-কষ্ট তোমাদের স্পর্শ করে, তখন তাঁর কাছেই তোমরা আকুল আবেদন জানাতে থাকো। অতঃপর যখন তিনি তোমাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন, তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে অন্যকে শরিক করে বসে আমি তাদের যা দিয়েছি, তার না-শোকরি করার জন্য। অতএব, তোমরা ভোগ করে নাও। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।" [সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ৫৩-৫৫] "সমুদ্রে যখন বিপদ তোমাদের পেয়ে বসে, তখন তাঁকে ছাড়া অন্য যাদের তোমরা (উপাস্য ভেবে) আহ্বান করো, তারা (তখন তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদের স্থলে এনে বাঁচিয়ে দেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ হলো বড়ই

আমাদের মুশরিকদের বিরোধিতা করতে শিখিয়েছেন। আদেশ করেছেন যেন আমরা সুখের সময়েও আল্লাহকে স্মরণ করি, দ্বীনকে একমাত্র তাঁর জন্যই বিশুদ্ধ করে নিই, তাঁরই নৈকট্য কামনা করি। এর ফলে বান্দার দুঃখের সময়ে বান্দাকে জানা আল্লাহর জন্য জরুরি হয়ে পড়বে।

এরপর বলা হয়েছে শুধু আল্লাহর কাছেই সবকিছু চাইতে এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করতে। সুখ-সুঃখ উভয় সময়েই তা করতে হবে।

তারপর সেই মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে, যার উপর আগের সকল বিষয় নির্মিত হয়েছে—এক আল্লাহই উপকার করেন, ক্ষতিসাধন বা দূরীভূত করেন, দান করেন ও দান করা থেকে বিরত থাকেন, পুরো সৃষ্টিজগৎ মিলেও আল্লাহর নির্ধারিত বিষয়ের অন্যথা করতে অক্ষম।

এই উপলব্ধি বান্দাকে সৃষ্টির উপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে। বান্দা কোনো সৃষ্টির কাছে হাত পাতা, সাহায্য চাওয়া এবং উপকার ও অপকারের আশা করা থেকে বিরত হয়।[১৭২] সৃষ্টির প্রতি বান্দার ভয়ও দূরীভূত হয়। এর আবশ্যক ফলাফলস্বরূপ, সে একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করে এবং আল্লাহরই কাছে সাহায্য চায়। আল্লাহর আনুগত্যকে সে সৃষ্টির আনুগত্যের আগে স্থান দেয়। সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে অসন্তুষ্ট করে হলেও বান্দা আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। আবু সাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, "ইয়াকীনের দুর্বলতার একটি লক্ষণ এই যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়। আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন, তার জন্য তাদের প্রশংসা করে; আল্লাহ যা তাকে দেননি, তার

অকৃতজ্ঞ।" [সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৬৭] "দুঃখ-মুসিবত যখন মানুষকে স্পর্শ করে, তখন সে তার প্রতিপালককে ডাকতে থাকে তাঁর প্রতি বড়ই একনিষ্ঠ হয়ে। অতঃপর তিনি যখন নিজ পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দিয়ে তাকে ধন্য করেন, তখন সে পূর্বে যে জন্য তাঁকে ডেকেছিল তা ভুলে যায় এবং অন্যদের আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায় তাঁর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্য।" [সূরাহ আয-যুমার, ৩৯ : ৮]

[১৭২] হালিমি, *আল-মিনহাজ ফী শুয়াবুল ঈমানে* বলেন, "আশার কয়েক রকম রূপ আছে : ১. আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের আশা, ২. তা পাওয়ার পর ধরে রাখার আশা, ৩. অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে দূরে থাকার আশা, ৪. ঘটে যাওয়া কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিসের সমাপ্তি দেখার আশা। কারও প্রতি ভয়ের মতো করে আশাও যদি কারও হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে যায়, তাহলে বিনয় ও নম্রতার দিকে ধাবিত করে। কারণ, আশা আর ভয় হাত ধরাধরি করে চলে। ভীত ব্যক্তি ভয়ের বিপরীতটিরও আশা করে। সে আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তাঁর কাছে কামনা করে। তেমনি তাঁকে ভয় করা ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হারানোর ভয় করে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। কাজেই যে ব্যক্তিই ভয় করে, সে আশাও করে। আর যে আশা করে, সে ভয়ও করে।"

জন্য তাদের তিরস্কার করে। মানুষ কেবল কামনা করলেই আল্লাহর রিযক লাভ করতে পারে না, আবার কেবল ঘৃণা করলেই তা দূর করতে পারে না।"[১৭৩]

কবি সত্যিই বলেছিলেন :

যদি স্বাদ নিতে জানতে, যখন জীবন তিক্ত,
রাগের মুখেও যদি মানুষ শান্ত থাকা শিখত,
জীবন সহজ হয় সত্যিকারের ভালোবাসায়ই খালি,
পৃথিবীর উপর যা-ই আছে, সেসব তো ধুলাবালি।

জেনে রাখুন, জমিনের উপর চলমান প্রতিটি প্রাণীই কেবল ধুলা আর মাটি। রাজাধিরাজ আল্লাহর আনুগত্যের আগে ধুলাবালি আর মাটির আনুগত্যকে কী করে স্থান দেওয়া সম্ভব? মালিক ও দাতাকে অসন্তুষ্ট করে মাটিকে সন্তুষ্ট করে কী লাভ? সত্যিই অবাক করা ব্যাপার!

কুরআনের বহু জায়গায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই দান করেন ও দান করা থেকে বিরত থাকেন :

"আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা নিবারণ করার কেউ নেই। আর তিনি যা বারিত করেন, কেউ তা প্রেরণ করতে পারে না..."[১৭৪]

"আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দিতে চান, তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই। আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তাহলে তাঁর

---

[১৭৩] আবু নুয়াইম, *আল-হিলইয়াহ* : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১০৬; বায়হাকি, *শুয়াব* : ২০৭-এ বলেন, এর বর্ণনাসূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আছেন, যিনি যঈফ। যাহাবি, *আল-মিযান* : খণ্ড ৪, ৩২ পৃষ্ঠায় বলেন, "তাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন এবং কেউ তাঁর মিথ্যুক হওয়ার অভিযোগ করেন।" এ ছাড়াও এর ইসনাদে আতিয়্যাহ আল-আওফি নামক একজন যঈফ বর্ণনাকারী আছেন। সুয়ুতি, *আল-জামি* : ২৪৯৩ একে যঈফ বলেছেন এবং আলবানি, *আয-যঈফা* : ১৪৮২তে একে মাওযু বলেছেন। তাবারানি, *আল-কাবির* : ১০৫১৪ এবং বায়হাকি : ২০৮ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কাউকে সন্তুষ্ট কোরো না। আল্লাহর দয়ার কারণে অন্য কারও প্রশংসা কোরো না। আল্লাহ যা (হতে দিতে) চাননি, তার জন্য অন্য কাউকে তিরস্কার কোরো না। কোনো ব্যক্তির চাইলেই আল্লাহর রিযক চলে আসে না এবং কোনো ব্যক্তির অপছন্দ করলেই তা দূর হয়ে যায় না।" আলবানি, *যঈফ আত-তারগীব* : ১০৬৪ একে মাওযু বলেছেন। বায়হাকি : ২০৯ এবং ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ইয়াকিন* : ৩২ এ একই কথা ইবনু মাসউদ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে এনেছেন। দেখুন অধ্যায় নয়, ফুটনোট: ৩১

[১৭৪] সূরাহ ফাতির, ৩৫ : ২

অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই...”[১৭৫]

“বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ্ আমার ক্ষতি করতে চাইলে আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ডাকো, তারা কি সে ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি তাঁর অনুগ্রহ ঠেকাতে পারবে?...”[১৭৬]

আল্লাহ্ তা'আলা নূহ ﷺ-এর উক্তি উল্লেখ করেন :

“হে আমার সম্প্রদায়, আমার অবস্থিতি আর আল্লাহ্র আয়াতসমূহের দ্বারা তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের নিকট অসহ্য মনে হয়, (তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই, কারণ) আমি তো কেবল আল্লাহ্র উপর ভরসা করি। তোমরা তোমাদের শরিকদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। পরে তোমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমাদের মাঝে যেন কোনো অস্পষ্টতা না থাকে...”[১৭৭]

আল্লাহ্ তা'আলা হূদ ﷺ-এর উক্তি উল্লেখ করেন :

“আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি আর তোমরাও সাক্ষী হও যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাকে তাঁর শরিক করো, তার সাথে আমি পুরোপুরি সম্পর্কহীন। তাঁকে (আল্লাহ্) ব্যতীত তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো আর আমাকে একটুও অবকাশ দিয়ো না। আমি নির্ভর করি আল্লাহ্র উপর, যিনি আমার আর তোমাদের প্রতিপালক...”[১৭৮]

একজন সালাফ বলেছেন :

**আল্লাহ্ আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা তো হবেই,
হুঁশিয়ারি দিয়ে তা এড়ানো গেলে তো এড়ানো যেত কবেই!
আমরা যতটা না নিজেদের, তারচেয়ে বেশি আমরা আল্লাহ্র,
আমাদের পরিচয় তো কেবল এক তাকদীরে বাঁধা বান্দাহ্র।**

ফুদাইল আল-ফাকাহ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি একবার নালিশ করল। তিনি জবাব দিলেন, “তুমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে নালিশ করলে?”

---

[১৭৫] সূরাহ্ ইউনুস, ১০ : ১০৭
[১৭৬] সূরাহ্ আয-যুমার, ৩৯ : ৩৮
[১৭৭] সূরাহ্ ইউনুস, ১০ : ৭১
[১৭৮] সূরাহ্ হূদ, ১১ : ৫৪-৫৬

একজন সালাফ বলেছেন :

যে রায় ইচ্ছা দাও, তোমার রায় হবে না বাস্তবায়ন,
আল্লাহর দেওয়া তাকদীরই হবে আসল কার্যকারণ,
রবের অধীনে সবকিছু, তাঁরই ইচ্ছা সর্বদা হয় সাধন।

অধ্যায় নয়
ধৈর্যের ফযিলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ।" গুফরাহর আযাদকৃত দাস উমারের বর্ণনায় ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে,

> "তুমি যদি ইয়াকীনপূর্ণ অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর জন্য আমল করতে পারো, তবে তা করো। আর যদি তা না পারো, তাহলে জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ।"[১৭৯]

এখানে ইয়াকীন অর্থ হলো তাকদীরের উপর ঈমান রাখা। তাঁর ছেলে আলি বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস তাঁর পিতার সূত্রে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে স্পষ্ট করে এ অর্থের উল্লেখ আছে। এতে অতিরিক্ত শব্দ রয়েছে, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি কীভাবে ইয়াকীনের সাথে কাজ করতে পারি?' তিনি ﷺ বললেন, 'তুমি জানবে যে, যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে তা হওয়ারই ছিল, আর যা আপতিত হয়নি তা কিছুতেই হওয়ার ছিল না।'" তবে এ বর্ণনার সনদ দুর্বল।

তাকদীরের প্রতি ইয়াকীন যখন অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যাবে, তখন এর আবশ্যক ফলাফলস্বরূপ অন্তর থাকবে ধীরস্থির ও শান্ত। এই অর্থই প্রকাশ পেয়েছে এই আয়াতে :

> "পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোনো বিপদ আসে না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখিনি। এটি (করা) আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। এটা এ জন্য যে, তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য তোমরা যেন হতাশাগ্রস্ত না হও। আর তোমাদের যা দান করা হয়েছে, তার জন্য তোমরা যেন উৎফুল্ল না হও। কেননা, আল্লাহ অহংকারী ও অধিক গর্বকারীকে পছন্দ করেন না।"[১৮০]

---

[১৭৯] আবু নুয়াইম : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৪

[১৮০] সূরাহ আল-হাদীদ, ৫৭ : ২২-২৩

এই আয়াতের তাফসীরে দাহহাক ﷺ বলেন, "তিনি তাদের মনোবল দৃঢ় করলেন, যাতে 'তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য তোমরা যেন হতাশাগ্রস্ত না হও। অতএব দুনিয়াবি জিনিসের জন্য দুঃখ কোরো না। কারণ, আমি তা তোমার জন্য নির্ধারণই করিনি।' আর 'তোমাদের যা দান করা হয়েছে, তার জন্য তোমরা যেন উৎফুল্ল না হও। সেসব দুনিয়াবি জিনিসের জন্য অহংকারী হবে না যা তোমাদের দেওয়া হয়েছে, কারণ তা কখনোই আটকে রাখার ছিল না।'" বর্ণনাটি ইবনু আবিদ্দুনিয়া ﷺ-এর সূত্রে এসেছে।

সাইদ ইবনু যুবাইর ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "'তোমাদের যা দান করা হয়েছে' অর্থাৎ দুনিয়াবি প্রাচুর্য। কারণ, তুমি তো জানোই তোমার সৃষ্টির আগে থেকেই এটি নির্ধারিত ছিল।" ইবনু আবি হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন।

এর আলোকেই একজন সালাফ বলেছিলেন, "তাকদীরের প্রতি ঈমান দুশ্চিন্তা ও হতাশা দূর করে দেয়।" নবীজি ﷺ এ দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন এই হাদীসের মাধ্যমে : "যা কিছু তোমার উপকার করবে, তা কামনা করো এবং আল্লাহর সাহায্য চাও। আর নিরাশ হোয়ো না। কোনো বিপদ ঘটলে বলবে না, 'ইশ! আমি যদি অমুক কাজটা না করতাম!' বরং বলো, 'আল্লাহ্ তা নির্ধারণ করেছেন। তিনি যা চেয়েছেন, তা-ই করেছেন।' 'যদি' শয়তানের কুমন্ত্রণার দুয়ার খুলে দেয়।"[১৮১]

অর্থাৎ, বিপদের সময় মানুষ যদি তাকদীরের প্রতি ঈমানের কথা স্মরণ করে, তাহলে শয়তানের ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

আনাস ﷺ বলেন, "আমি দশ বছর নবীজি ﷺ-এর খেদমত করেছি। কখনো তিনি আমাকে বলেননি, 'এটা কেন করলে?' 'ওটা করলে না কেন?'"[১৮২] তিনি বলেন, "তাঁর পরিবারের কেউ যদি আমাকে বকা দিত, তিনি বলতেন, 'বাদ দাও। কোনো কিছু তাকদীরে থাকলে তা হবেই।'" অতিরিক্ত শব্দসহ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ﷺ বর্ণনা করেছেন।[১৮৩]

---

[১৮১] *মুসলিম* : ২৬৬৪; আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত।
[১৮২] *বুখারি* : ২৭৬৮-৬০৩৮-৬৯১১; *মুসলিম* : ২৩০৯
[১৮৩] আহমাদ : ১৩৪১৮; বায়হাকি, *শুয়াব* : ৮০৭০; বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী এর ইসনাদ গ্রহণযোগ্য। অনুরূপ, আরনাউত, তাখরিজ মুসনাদ।

ত্রুটিপূর্ণ এক সনদে ইবনু আবিদ্দুনিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আয়িশা ﷺ বলেন, "নবীজি ﷺ ঘরে ফিরলে সবচেয়ে বেশি যে কথাটি বলতেন তা হলো, 'আল্লাহ যা কিছু বিষয় নির্ধারিত রেখেছেন তা ঘটবেই।'" এ ছাড়া আরেকটি মুরসাল বর্ণনায় আছে, নবীজি ﷺ ইবনু মাসউদ ﷺ-কে বলেন,

> "বেশি দুশ্চিন্তা করবে না। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তা ঘটবেই। যে রিযক তোমার জন্য আছে, তা আসবেই।"[১৮৪] আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ[১৮৫] (বলা) হলো নিরানব্বইটি রোগের আরোগ্য, যার সবচেয়ে কমটি হলো দুশ্চিন্তা।"[১৮৬]

এই কথার বাস্তবায়নের আবশ্যক ফলাফল হলো আল্লাহর কাছে সকল বিষয় ন্যস্ত করে এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ না চাইলে কোনো কিছুই ঘটবে না। এর উপর ঈমান দুশ্চিন্তা ও হতাশা দূর করে দেয়। নবীজি ﷺ এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

> "আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন এমন কোনো কিছুর জন্য আল্লাহকে গালিগালাজ করবে না।"[১৮৭]

বান্দা যখন আল্লাহর তাকদীরের মাধ্যমে তাঁর হিকমাহ ও রহমতের বিষয়টি বুঝতে পারে, সে বুঝতে পারে যে, তাকদীরের জন্য আল্লাহকে তিরস্কার করা সমীচীন নয়। সে আল্লাহর নির্ধারিত বিষয়ে সন্তুষ্টি বোধ করবে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন:

---

[১৮৪] বায়হাকি, *শুয়াব* : ১১৮৮; ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ; আল-ইসাবাহ* : খণ্ড ১, ১০৪ পৃষ্ঠায় ইবনু হাজার বলেন, এর ইসনাদে আইয়্যাশ ইবনু আব্বাস নামক একজন যঈফ বর্ণনাকারী আছেন। আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ৪৭৯৩ এ একে যঈফ বলেছেন। অনুরূপ *আস-সহীহাহ* : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪ এ তিনি উমার ﷺ ও আবু যার ﷺ থেকে এই হাদীসের আরও দুটি দুর্বল বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন

[১৮৫] অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কারও কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই।

[১৮৬] তাবারানি, *আল-আসওয়াত* : ৫০২৮; ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ*; হাকিম : ১৯৯০ একে সহীহ বলেছেন, কিন্তু যাহাবি দেখান যে এতে বিশর নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। হায়সামি : খণ্ড ১০, ৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন, এর ইসনাদে বিশর ইবনু রাফি আছেন, যিনি দুর্বল। ইবনুল জাওযি, *আল-ইলাল* : খণ্ড ২, ৩৪৮ পৃষ্ঠায় বলেন এটি সহীহ নয়। আলবানি একে যঈফ বলেছেন, *যঈফ আত-তারগীব* : ৯৭০-১১৪৭

[১৮৭] আহমাদ : ১৭৮১৪-২২১৭; বুখারি, খালাক আফআলুল ইবাদ : ১৬৩
মুনযিরি, আত-তারগীব : খণ্ড ২, ২৫৭ পৃষ্ঠাতে দুটি বর্ণনাসূত্র উল্লেখের পর তাদের একটিকে হাসান বলেন। আলবানি, আস-সহীহাহ : ৩৩৩৪ এবং সহীহুত তারগীব : ১৩০৭ এ একে হাসান লি গাইরিহি বলেন। আরনাউত বলেন, হাদীসটি হাসান বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

> **"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন..."[১৮৮]**

এর তাফসীরে আলকামাহ ﷺ বলেন, "মানুষের উপর আসা বিপদের কথা এখানে বলা হচ্ছে। কিন্তু সে জানে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাই সে তা মেনে নেয় এবং সন্তুষ্ট থাকে।"

এক সহীহ হাদীসে আছে,

> "আল্লাহ মুমিনের জন্য যা-ই নির্ধারণ করেন, তা তার জন্য কল্যাণকর। সে যদি ভালো অবস্থায় থাকে, তাহলে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি খারাপ অবস্থায় পড়ে, তাহলে সে ধৈর্যধারণ করে এবং তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। কেবল মুমিনের জন্যই এ বিষয়টি সত্য।"[১৮৯]

> **"বলে দাও, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের ঘটবে না, তিনিই আমাদের রক্ষক, আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।' বলো, 'তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষা করছ, তা দুটো ভালোর একটি ছাড়া আর কিছুই না...'"[১৯০]**

এখানে আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন যে, তাঁর নির্ধারিত বিষয় ছাড়া মুমিনদের আর কিছুই হবে না। এ থেকে বোঝা যায় সেই বিষয়টি সহজ বা কঠিন যা-ই হোক, একই কথা। তারপর তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি তাদের রক্ষক। তাঁকে যারা রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি ছেড়ে যাবেন না। নিশ্চয়ই তিনি তাদের কল্যাণ করার দায়িত্ব নেবেন :

> **"জেনে রেখো, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, কতই-না উত্তম অভিভাবক! কতই-না উত্তম সাহায্যকারী!"[১৯১]**

> **"তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষা করছ, তা দুটো ভালোর একটি ছাড়া আর কিছুই না..."[১৯২]**

তিরমিযিতে আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

---

[১৮৮] সূরাহ আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১১

[১৮৯] *মুসলিম* : ২৯৯৯; সুহাইব ইবনু সিনান ﷺ থেকে বর্ণিত।

[১৯০] সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ৫১-৫২

[১৯১] সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৪০

[১৯২] সূরাহ আর-তাওবাহ, ৯ : ৫২

> "আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। যে কেউ সন্তুষ্ট থাকে, সে সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর যে কেউ অসন্তুষ্ট হয়, সে অসন্তুষ্টি লাভ করবে।"[১৯৩]

আবুদ্দারদা ﷺ বলেন, "আল্লাহ কোনো কিছু নির্ধারণ করলে বান্দা এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ খুশি হন।" উম্মুদ্দারদা ﷺ বলেন, "যারা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট, তারাই সত্যিকারের প্রশান্তচিত্ত। কিয়ামাতের দিন তারা জান্নাতে এমন স্থান লাভ করবে, যা দেখে শহীদরাও হিংসা করবেন।"

ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাঁর ন্যায়বিচার ও জ্ঞানের মাধ্যমে ইয়াকীন ও সন্তুষ্টির মাঝেই আনন্দ রেখেছেন। আর সংশয় ও অসন্তুষ্টির মাঝে রেখেছেন দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতা।" নবীজি ﷺ-এর একটি হাদীস হিসেবেও কথাটি বর্ণিত আছে, তবে তার সনদ দুর্বল।

উমার বিন আব্দুল আযিয ﷺ বলতেন, "এই দু'আগুলো আমার জন্য আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনো প্রয়োজনই বাকি রাখেনি।" তিনি এই দু'আগুলো খুব বেশি বেশি করতেন, "হে আল্লাহ, আমাকে আপনার তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট রাখুন। আমাকে আপনার তাকদীরে এত বারাকাহ দিন, যাতে আমি এমন বিষয়ে বিলম্ব কামনা না করি, যা আপনি দ্রুত দেবেন এবং যা বিলম্বে দেবেন তাতে তাড়াহুড়া না করি।"[১৯৪]

ইবনু আওন ﷺ বলেন,

> "স্বাচ্ছন্দ্য ও কাঠিন্য উভয় অবস্থায় আল্লাহর তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো। এতে তোমার অস্থিরতা কমবে এবং আখিরাতের জন্য লাভজনক হবে। জেনে রেখো, বান্দা ততক্ষণ সত্যিকারের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার দরিদ্র অবস্থার সন্তুষ্টি সচ্ছলতার অবস্থার সন্তুষ্টির সমান হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছেকে নিজের কামনা-বাসনার বিপরীত দেখতে পেয়ে কী করে তুমি অসন্তুষ্ট হতে পারো? অথচ তুমি আল্লাহকে তোমার অবস্থার দেখভাল করার অনুরোধ করেছ। এমনটা হতেই পারে যে, তোমার ইচ্ছামতো সবকিছু হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যেতে। অথচ আল্লাহর নির্ধারিত বিষয় তোমার ইচ্ছের সাথে মিললে তুমি খুশি হয়ে ওঠো। উভয় অবস্থার কারণ হলো গায়েবের ব্যাপারে তোমার নিতান্ত অজ্ঞতা। এই অবস্থা নিয়ে

---

[১৯৩] তিরমিযি, ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ, ৪০৩১

[১৯৪] বায়হাকি, *শুয়াব*: ২২৭

বিচারদিবসে যাওয়ার সাহস হয় কী করে! তুমি নিজের প্রতি সদ্ব্যবহার করোনি, সন্তুষ্টির সঠিক মাত্রায়ও পৌঁছতে পারোনি।"

চমৎকার কিছু কথা। এর অর্থ হলো যে, বান্দা যখন আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেওয়ার দু'আ (ইস্তিখারা) করে, তখন আল্লাহ যে সিদ্ধান্তই দিন তাতে তার সন্তুষ্ট থাকতে হবে—পছন্দ হোক বা না হোক। কারণ, সে তো জানেই না কোন অবস্থায় তার কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেন, তার জন্য তিনি তিরস্কারযোগ্য নন। আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করবেন, এতে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো মনোবল নেই, এমন মানুষদের এ কারণেই ইস্তিখারার দু'আয় 'সকল কল্যাণকর অবস্থায়' কথাটি যোগ করার পরামর্শ দিতেন ইবনে মাসউদ[১৯৫] সহ কিছু সালাফ। অন্যথায় সে এমন ফিতনায় পতিত হতে পারে, যাতে সে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। এ কথাটি নবীজি ﷺ-এর হাদীস হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। তবে তার সনদ দুর্বল।[১৯৬]

সাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

> "বান্দার সৌভাগ্য হলো আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে সিদ্ধান্ত চাওয়ার পর তাঁর প্রদান করা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকতে পারা। আর বান্দার দুর্ভাগ্য হলো আল্লাহর সিদ্ধান্ত চাওয়া পরিত্যাগ করা আর তিনি যা নির্ধারণ করেন, তাতে অসন্তুষ্ট হওয়া।" হাদীসটি *তিরমিযি* ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।[১৯৭]

তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি অর্জনের অনেক উপায় আছে :

১. আল্লাহর প্রতি বান্দার দৃঢ় ইয়াকীন থাকা যে, তিনি মুমিনের জন্য যা নির্ধারণ করেন তা-ই কল্যাণকর। সে যেন দক্ষ ডাক্তারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা রোগী। ডাক্তারের পথ্য তার ব্যথার উদ্রেক করুক বা না করুক, সে সন্তুষ্টই থাকবে। কারণ, সে জানে যে, ডাক্তার তাকে সর্বাধিক কল্যাণকর পথ্যই দিচ্ছেন। ইবনে আওল তাঁর উক্তিতে এর কথাই বলেছেন।

২. সন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ্ যে প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদা করেছেন, তা স্মরণ করা। বান্দা এটি নিয়ে চিন্তায় এমনই মগ্ন হয়ে যেতে পারে যে, বাকি সব ব্যথা সে

---

[১৯৫] বায়হাকি, *শুয়াব* : ২০৫

[১৯৬] তাবারানি, *আল-কাবির* : ১০০১২-১০০৫২; ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। এটি যঈফ।

[১৯৭] আহমাদ : ১৪৪৫ এবং তিরমিযি : ২১৫১; তিরমিযি একে গারীব বলেছেন, কারণ এর ইসনাদে হাম্মাদ ইবনু হুমাইদ আছেন, যিনি শক্তিশালী নন। আরনাউত এর ইসনাদকে যঈফ বলেছেন। আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ১৯০৬ এ একে যঈফ বলেছেন।

ভুলেই যাবে। সালাফদের মধ্যে একজন নারী পড়ে যান, এতে তাঁর পায়ের নখ ভেঙে যায়। তিনি হেসে উঠে বলেন, "তাঁর কাছে এর যে প্রতিদান তা ভেবে আমি ব্যথার তিক্ততা ভুলে গেছি।"

৩. যেই সত্তা বিপদ পাঠান, তাঁর ভালোবাসায় নিজেকে মগ্ন করে ফেলা। তাঁর অসীম প্রাচুর্য, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য, ত্রুটিহীনতা নিয়ে চিন্তা করা। এমন সচেতনতার ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, ইউসুফ ﵇-কে দেখে মিসরের নারীদের হাত কাটার ব্যথা ভুলে যাওয়ার[১৯৮] মতো করেই বান্দা ব্যথা ভুলে যাবে। পূর্বে বর্ণিত অবস্থার চেয়ে এটি আরও উচ্চতর পর্যায়।

জুনাইদ ﵀ বলেন তিনি সিররি ﵀-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, প্রেমিক বিপদের ব্যথা অনুভব করেন কি না। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "না।" এ কথার মাধ্যমে তিনি এই উচ্চতর পর্যায়ের কথা বলছেন। এ কথার আলোকেই বিপদে পতিত একদল মানুষ বলেছিলেন, "তিনি (আল্লাহ) আমাদের সঙ্গে যা করতে চান, তা-ই করুন। এমনকি তিনি যদি আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি একটি করে কেটে ফেলতেন, এতে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসাই কেবল বাড়ত।"

তাঁদের মধ্যে একজন বলেছেন :

প্রেমের আতিশয্য যদি টুকরো টুকরো করে কাটে আমায়,
আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি ছাড়া তাতে কিছুই হতো না হায়।
আমি হয়ে থাকব ভালোবাসার কাছে বন্দী,
তব সন্তুষ্টির খোঁজেই পৌঁছে যাব জীবনসন্ধি।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ তাঁর সম্পত্তি, সম্পদ, সন্তান ও দাসদের ছেড়ে গিয়েছিলেন। তাওয়াফ করার সময় তিনি তাঁর পুত্রকে দেখতে পান, কিন্তু তাঁর সাথে কথা বলেননি। তিনি বলেন :

সবকিছু থেকে হিজরত করেছি তোমাকে পাবার আশায়
অধীনস্থদের ছাড়িয়া এসেছি তোমাকে দেখার নেশায়।
তুমি আমায় টুকরো করলেও বেড়েই চলব ভালোবাসায়।

---

[১৯৮] "যখন তারা তাকে দেখল, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল আর নিজেদের হাত কেটে ফেলল আর বলল, 'আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এ তো মানুষ নয়, এক সম্মানিত ফেরেশতা!'" [সূরাহ ইউসুফ, ১২:৩১]

আল্লাহর এমনই একদল প্রেমিক ছিলেন ফুদাইল ও ফাতহুল মাওসিলির মতো ব্যক্তিরা। তাঁরা যদি এমন অবস্থায় ঘুমোতে যেতেন যে, রাতের খাবার খাওয়া হয়নি বা জ্বালানোর মতো কুপি পাওয়া যায়নি, তাহলে তাঁরা আনন্দে কান্না করতেন।

শীতকালে ফাতহ ﷺ তাঁর পরিবারকে জড়ো করে নিজের চাদর দিয়ে তাদের ঢেকে নিয়ে বলতেন,

> "(হে আল্লাহ) আপনি আমাকে ক্ষুধার্ত রেখেছেন, তাই আমি আমার পরিবারকে ক্ষুধার্ত রেখেছি। আপনি আমাকে খ্যাতিহীন করেছেন, তাই আমি আমার পরিবারকে খ্যাতিহীন করেছি। এমনটা আপনি আপনার প্রিয় বান্দাদের সাথেই করে থাকেন, আমি কি তাদের একজন? আমার কি আনন্দিত হওয়া উচিত নয়?"[১৯৯]

একজন সালাফ অসুস্থ ছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি কিছু লাগবে?" তিনি বলেন, "তাঁর (আল্লাহর) কাছে যা সবচেয়ে প্রিয়, আমার কাছেও তা-ই প্রিয়।"[২০০]

এর আলোকে একজন বলেছিলেন :

আপনার শাস্তি মধুর, যার থেকে দূরত্বও নিকট সমধিক,
আপনি আমার প্রাণেরই মতো, বরং তার চেয়ে অধিক।
এটাই আমার জন্য যথেষ্ট,
যাতে তুমি তুষ্ট, তাতে আমিও তুষ্ট।

আবুত্তুরাব ﷺ এই চরণগুলো রচনা করেছেন :

বিভ্রান্ত হোয়ো না কেউ, প্রেমিকেরও তো চিহ্ন আছে,
নির্দিষ্ট পথে উপহার পাঠায় সে প্রেমাস্পদের কাছে।
রবের দেওয়া বিপদে তুষ্ট, তিনি যা করেন তায় খুশি,
তাঁর দেওয়া দারিদ্র্যই প্রাচুর্য, বরং তার চেয়েও বেশি।

তাঁরা এক ব্যক্তির কাছে গেলেন, যার ছেলে জিহাদে শহীদ হয়েছে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, "আমি পুত্রশোকে কাঁদছি না। তরবারির আঘাত পাওয়ার সময় আল্লাহর প্রতি সে কতই-না সন্তুষ্ট ছিল, তা ভেবেই কাঁদছি।"

---

[১৯৯] আবু নুয়াইম : খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৯২
[২০০] যাহাবি, *সিয়ার* : খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৮২; ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ আল-কাত্তানের উদ্ধৃতি দিয়ে।

তারা যদি মোর মৃত্যুই চায়, সেটাই হোক না তবে!
আল্লাহ যা চান, সেটা না হওয়া আমি চেয়েছি কবে?

মূলকথা হলো, রাসূল ﷺ চেয়েছেন ইবনে আব্বাস رضي الله عنه যেন সামর্থ্য থাকলে সন্তুষ্ট অবস্থায় আমল করেন। যদি সামর্থ্য না থাকে, তিনি বলেন, "যদি তা না পারো, তাহলে জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ।" এ থেকে বোঝা যায়, যেসব নির্ধারিত বিষয় সহ্য করা কঠিন, তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক নয়, তবে অত্যন্ত উত্তম। যে সন্তুষ্ট হতে পারে না, তাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্য আবশ্যক। এর ফলে মহাকল্যাণ আসে। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যের আদেশ দিয়েছেন এবং এর জন্য বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন,

"...আমি ধৈর্যশীলদের তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।"[২০১]

"...ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দান করো। নিশ্চয়ই যারা বিপদকালে বলে থাকে, 'আমরা আল্লাহরই, আর আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' এদের প্রতিই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও করুণা। আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[২০২]

"...সুসংবাদ দাও সেই বিনীতদের, 'আল্লাহ' নামের উল্লেখ হলেই যাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করে..."[২০৩]

আল-হাসান رحمه الله বলেন, "সন্তুষ্টির অবস্থা বিরল। তবে ধৈর্য হলো মুমিনের আশ্রয়।"[২০৪] সুলাইমান আল-খাওয়াস বলেন, "ধৈর্যের মর্যাদা সন্তুষ্টির নিচে। সন্তুষ্ট ব্যক্তির অবস্থা এই যে, বিপদ আসুক বা না আসুক, সে সন্তুষ্ট। আর ধৈর্য হলো বিপদ আসার পর অবিচলভাবে তা সহ্য করা।"

সন্তুষ্টি আর ধৈর্যের মাঝে পার্থক্য আছে। ধৈর্য হলো বিপদ দেখতে পাওয়ার পর অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে আত্মাকে লাগাম পরানো।[২০৫] আর সন্তুষ্টি হলো যেকোনো

---

[২০১] সূরাহ আয-যুমার, ৩৯ : ১০

[২০২] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৫৫-১৫৭

[২০৩] সূরাহ আল-হাজ্জ, ২২ : ৩৪-৩৫

[২০৪] আবু নুয়াইম : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৪২; উমার ইবনু আব্দুল আযীয থেকে।

[২০৫] **সবর** : বিরত থাকা ও সংযত হওয়া। রাগিব বলেন, "এটি হলো শরিয়ত ও আকল অনুযায়ী আত্মাকে বিরত রাখা।" জাহিয বলেন যে, এটি স্থিরবুদ্ধিতা ও সাহসের সমন্বয়ে গঠিত এক গুণ। মুনাউয়ি বলেন যে, এটি হলো শারিরীক ও মানসিক অসুবিধা ও ব্যথার মুখোমুখি হতে পারার ক্ষমতা। এটি হলো আত্মাকে কৃপণতা ও হতাশা থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ করা থেকে

অবস্থায়ই যা হচ্ছে, তা মেনে নেওয়া। সন্তুষ্টির কারণে ব্যথা কমে যায়, এমনকি একদমই শূন্য হয়ে যেতে পারে। কারণ, অন্তর তখন ইয়াকীন ও জ্ঞানের কোমল পরশ পেয়ে গেছে।[২০৬]

উমার বিন আব্দুল আযীয, ফুদাইল, আবু সুলাইমান, ইবনুল মুবারাকসহ অনেক সালাফ তাই বলতেন, "সন্তুষ্ট ব্যক্তি বর্তমানে যেই অবস্থায় আছে, সেটা ছাড়া আর অন্য কিছু কামনাই করে না। কিন্তু ধৈর্যশীল ব্যক্তি (অবস্থার পরিবর্তন) কামনা করে।" অনেক সাহাবাগণের থেকেও এ রকম সন্তুষ্টির অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন : উমার ﷺ, ইবনে মাসউদ ﷺ প্রমুখ।

আব্দুল আযীয ইবনে আবু রুওওয়াদ ﷺ বলেন, "বানী ইসরাঈলের এক আবেদ ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখানো হলো, অমুক মহিলা জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হবে। তিনি সেই নারীর বাসায় তিন দিনের জন্য গেলেন, যাতে তিনি কী আমল করেন তা জানা যায়। কিন্তু রাতে পুরুষটি যখন সালাত পড়তেন, নারীটি ঘুমাতেন। পুরুষটি যেদিন সিয়াম রাখতেন, নারীটি খাওয়া-দাওয়া করতেন। চলে যাওয়ার সময় তিনি

বিরত রাখা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশৃঙ্খল হওয়া থেকে বিরত রাখা। এটি হলো সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর হুকুমের উপর দৃঢ় থাকা এবং সর্বোত্তম উপায়ে বিপদের মোকাবেলা করা।
ইবনু হিব্বান, *রওদাতুল উকালা* : পৃষ্ঠা ১২৬-১২৮ এ বলেন, বুদ্ধিমানের উপর আবশ্যক হলো বিপদের আগমনের শুরুতে সবর অবলম্বন করা। আর যখন সে এতে দৃঢ় হয়ে যাবে, তখন সন্তুষ্টির (রিদ্বা) পর্যায়ে উন্নীত হওয়া। কেউ যদি সবর দ্বারা পরিপুষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে তার উচিত নিজের মধ্যে সবরের পরিচর্যা করা (তাসাব্বুর), কারণ এটিই রিদ্বার প্রথম ধাপ। মানুষের যদি সত্যিই সবর থাকে, তাহলে সে মহান হয়ে যাবে। কারণ, এটিই সকল কল্যাণের ঝরনা আর সকল আনুগত্যের ভিত্তি... এর দিকে যাওয়ার ধাপগুলো হলো সচেতনতা (ইহতিমাম), উপলব্ধি (তায়াক্কুয), পরীক্ষা-নিরীক্ষা (তাহাব্বুত) এবং তাসাব্বুর। এর পরেই আসে রিদ্বা। আর এটিই আত্মিক উন্নতির শিখর... তিনটি বিষয়ে সবর প্রদর্শন করতে হয় : ১) গুনাহ থেকে সবর, ২) আল্লাহর আনুগত্যে লেগে থাকার ব্যাপারে সবর, ৩) বিপদ-আপদের মুখে সবর। অনুরূপ, ইবনুল কাইয়্যিম, *মাদারিজুস সালিকীন* : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৫

[২০৬] রিদ্বা : হতাশা ও বিরক্তির বিপরীত। জুরানি একে বলেছেন তাকদীর কার্যকর হতে দেখে হৃদয়ে আনন্দ লাভ করা। ইবনুল কাইয়্যিম, *মাদারিজ* : খণ্ড ২, ১৮৫ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন যে, এটি হলো তাকদীরের ওঠা-নামায় অন্তর প্রশান্ত রাখা এবং এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ এতে কল্যাণকর কিছুই রেখেছেন।
বায়হাকি, *শুয়াব* : ২০৯-এ উল্লেখ আছে, ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, "রিদ্বা হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষকে সন্তুষ্ট না করা, আল্লাহর দেওয়া রিযকের কারণে অন্য কাউকে প্রশংসা না করা, আল্লাহ যা দেননি তার জন্য অন্য কাউকে দোষারোপ না করা। কারও ইচ্ছায় আল্লাহর রিযক আসে না, আবার কেউ ইচ্ছা না করলেই তা বন্ধ হয়ে যায় না। আল্লাহ তাঁর ন্যায়বিচার ও জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি মুক্তি ও আনন্দ রেখেছেন ইয়াকীন ও সন্তুষ্টিতে, আর দুশ্চিন্তা ও হতাশা রেখেছেন সন্দেহ ও অসন্তুষ্টিতে।"

নারীটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কোন আমলটি আপনার কাছে সেরা মনে হয়?' নারীটি বললেন, 'আপনি আমাকে যা করতে দেখেছেন, তার চেয়ে বেশি আমি কিছুই করি না। কিন্তু আমি যখন কষ্টে থাকি, তখন স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করি না। যখন অসুস্থ থাকি, তখন সুস্বাস্থ্য কামনা করি না। যখন ক্ষুধার্ত থাকি, তখন ভরপেট হওয়া কামনা করি না। যখন রোদে থাকি, তখন ছায়া কামনা করি না।' লোকটি বললেন, 'আল্লাহর কসম! এই গুণ তো বান্দাদের আয়ত্তের বাইরে।'"[২০৭]

বিপদের প্রথম আঘাতেই ধৈর্যধারণ করতে হয় বলে নবীজির সহীহ হাদীসে এসেছে।[২০৮] আর বিপদ ভোগ করতে থাকা অবস্থায় সন্তুষ্টি প্রদর্শন করতে হয়। যেমনটি নবীজি ﷺ দু'আ করতেন, "তাকদীরের লিখন সংঘটিত হয়ে যাবার পর আমি আপনার নিকট সন্তুষ্ট থাকার সামর্থ্য চাই।"[২০৯] কারণ, বিপদ আসার আগে বান্দা সহজেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু বিপদ আসার পর তার অবস্থা একদম বিপরীত হয়ে যেতে পারে। নির্ধারিত বিপদ চলে আসার পর যে সন্তুষ্টি প্রদর্শন করে, সে-ই সত্যিকারের সন্তুষ্ট।[২১০]

সারকথা হলো, ধৈর্যধারণ আবশ্যক। ধৈর্যের সীমানার বাইরেই থাকে অসন্তুষ্টি। যে কেউ আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট, তার পরিণাম হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। তার উপর তার নিজের অসন্তুষ্টির চেয়ে বেশি হবে বিপদের স্বাদ আর শত্রুদের পক্ষ থেকে আসা ক্ষতি। একজন সালাফ বলেছেন :

কোনো দুর্ঘটনায় হোয়ো না হতাশ
শত্রুকে ধরতে দিয়ো না তোমার রাশ
ধৈর্যের মাধ্যমেই দেখতে পাবে আশ,
দৃঢ়পদ থাকো যখন শত্রু-সঙ্গে হয় নিবাস।

---

[২০৭] এই ঘটনার কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। বর্ণনাকারী একজন আবিদ, পরহেজগার, তবে সকল আলিমের মতে তিনি মুরজিয়া সম্প্রদায়ের। ইমাম আবু হাতিম বলেন, "তার বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য।" আল্লামা ইবনুল জুনাইদ বলেন, "তিনি ভুয়া হাদীস বর্ণনা করতেন।" ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেন, "তিনি মুরজিয়া ছিলেন। খুব ইবাদাত করতেন। তবে হাদীস বর্ণনায় তিনি অন্যদের মত নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।"- শর'ঈ সম্পাদক

[২০৮] *বুখারি*: ১২৮৩-১৩০২-৭১৫৪; *মুসলিম*: ৬২৬; আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত।

[২০৯] আহমাদ : ১৮৩২৫; নাসাঈ : ১৩০৬-১৩০৭; আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ থেকে বর্ণিত। একে সহীহ বলেছেন, ইবনু হিব্বান : ১৯৭১; হাকিম : ১৯২৩ (যাহাবি একমত); আলবানি, তাখরিজুন নাসাঈ; এবং আরনাউত।

[২১০] অনুরূপ খাত্তাবি, *শানুদ দু'আ* : পৃষ্ঠা ১৩২

নবীজি ﷺ বলেন, "যে নিজের মাঝে ধৈর্য স্থাপন করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে বড় ও ব্যাপক উপহার আর কাউকে কখনো দেওয়া হয়নি।"[২১১]

উমার ؓ বলেন, "আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় ছিল ধৈর্যধারণের দিনগুলো।"[২১২] আলি ؓ বলেন, "ঈমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের মতো। যার ধৈর্য নেই, তার ঈমানই নেই।"[২১৩]

আল-হাসান ؒ বলেন, "ধৈর্য হলো জান্নাতি এক নিয়ামাত। আল্লাহ কেবল সম্মানিতদেরই তা দান করেন।" মায়মুন ইবনু মিহরান ؒ বলেন, "নবী বা অন্য কেউই কখনো ধৈর্যধারণ না করে কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেননি।" ইবরাহীম আত-তাইমী ؒ বলেন, "আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার উপর ঈমানের পর বান্দাকে সবচেয়ে বড় যে নিয়ামাত আল্লাহ দিয়েছেন, তা হলো ক্ষতির সময় ধৈর্য, পরীক্ষার সময় ধৈর্য, বিপদের সময় ধৈর্য।" তিনি এ কথা বলেছেন এই আয়াতের ভিত্তিতে :

"বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোনো ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর এবং আল্লাহর ভালোবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাজ্ঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিষ্কৃতি দিতে দান করবে এবং সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে, প্রতিশ্রুতি দানের পর স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্যধারণ করবে। এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই তাকওয়াবান।"[২১৪]

উমার বিন আব্দুল আযীয ؒ বলেন,

---

[২১১] *বুখারি* : ১৪৬৯-৬৪৭০; *মুসলিম* : ১০৫৩; আবু সাইদ আল-খুদরি ؓ থেকে বর্ণিত।
[২১২] তালিক বর্ণনা হিসেবে *বুখারিতে* উল্লেখিত। ইবনু হাজার, *ফাতহ* : খণ্ড ১১, ৩০৯ পৃষ্ঠায় বলেন, "আহমাদ : *কিতাবুয যুহদ* (১১৭)-তে এর পূর্ণাঙ্গ সূত্র উল্লেখ করেন মুজাহিদ পর্যন্ত, যিনি বলেন, "উমার ؓ বলেছেন..." এবং এটি সহীহ। এটি আরও উল্লেখ করেছেন ইবনুল মুবারাক, *আয-যুহদ* : ৬৩০ এবং ওয়াকি, *আয-যুহদ* : ১৯৮ এ।
[২১৩] ইবনু আবু শাইবাহ, আল-ঈমান : ১৩০; ওয়াকি : ১৯৯; বায়হাকি, শুয়াব : ৪০; আবু নুয়াইম : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬; সুয়ুতি, *আল-জামি* : ৫১৩৬ পৃষ্ঠায় একে যঈফ বলেছেন।
[২১৪] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৭৭

"আল্লাহ যদি কাউকে কোনো নিয়ামাত দিয়ে তা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তার বদলে শুধু ধৈর্য দান করেন, তাহলে যা দেওয়া হলো তা ছিনিয়ে নেওয়া বস্তুর চেয়ে উত্তম।" তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

"...আমি ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।"[২১৫]

একজন সালাফের পকেটে সব সময় একটি কাগজের টুকরা থাকত। সময়ে সময়ে তিনি তা বের করে পড়তেন। তাতে লেখা ছিল,

"তুমি ধৈর্যধারণ করে তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকো, কারণ তুমি তাঁর দৃষ্টির সামনেই আছো..."[২১৬]

সুন্দর ধৈর্য হলো বিপদের কথা বান্দার নিজের কাছে রাখা আর কাউকে এ বিষয়ে না বলা।

" ধৈর্যই উত্তম।"[২১৭]

একদল সালাফ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো কোনো অভিযোগ ছাড়াই ধৈর্যধারণ করা।[২১৮]

আহনাফ ইবনু কায়স ﷺ চল্লিশ বছর ধরে অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি এর কথা কাউকে বলেননি। আব্দুল আযীয ইবনু আবু রুওওয়াদ ﷺ-এর এক চোখ বিশ বছর যাবৎ অন্ধ ছিল। তাঁর ছেলে একদিন ভালো করে দেখে বললেন, "বাবা, আপনার এক চোখ অন্ধ।" তিনি বললেন, "গত বিশ বছর ধরে আমি এ নিয়ে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আছি।" ইমাম আহমাদ ﷺ অসুস্থ হলে তা নিয়ে কখনো কোনো অভিযোগ করতেন না। তাঁকে যখন জানানো হলো যে অসুস্থ অবস্থায় মুজাহিদ ﷺ গোঙানো অপছন্দ করতেন, তখন তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এ কাজ ত্যাগ করেন। তিনি নিজেকে বলতেন, "ধৈর্য ধরো, না হলে পস্তাতে হবে।"

এক জ্ঞানী ব্যক্তি এক রোগীর কাছে গিয়ে দেখলেন সে উহ্ আহ করছে। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, "এটি (রোগ) কার দেওয়া?" তাঁদের একজন বলতেন :

শরীর তো আমার অসুস্থতায় জর্জরিত,

---

[২১৫] সূরাহ আয-যুমার, ৩৯ : ১০

[২১৬] সূরাহ আত-তূর, ৫২ : ৪৮

[২১৭] সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ৮৩

[২১৮] অনুরূপ, তাবারি; ধৈর্য বিষয়ে ইবনুল কাইয়্যিমের বিস্তারিত আলোচনা দেখুন পরিশিষ্ট দুইয়ে।

তবু দর্শনার্থীদের কাছে রাখে লুকায়িত।
প্রিয়তমের তাকদীরে যদি অসন্তুষ্ট হয়,
তাহলে তো নফস সুবিচারকারী নয়।

ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায ﷀ বলেন,

"তুমি যদি তোমার রবকে ভালোবাসো আর তিনি তোনার জন্য ক্ষুধা ও বস্ত্রের অভাব নির্ধারণ করেন, তোমার উপর ফরয হলো এটি সহ্য করা এবং মাখলুকদের কাছ থেকে তা লুকানো। প্রেমিক তো বিনা অভিযোগে প্রেমাস্পদের থেকে পাওয়া কষ্ট সহ্য করে। তাহলে মাখলুকের কাছে তুমি এমন জিনিস নিয়ে কেন অভিযোগ করবে, যা সে তোমাকে দেয়ইনি?"

কবি বলেন,

আপনি ছাড়া সকলের কাজ
আমার ঘৃণায় খণ্ডিত,
আপনার হতে যা কিছু আসে
তা-ই সৌন্দর্যমণ্ডিত।

নবীজি ﷺ ও সাহাবাগণ ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধতেন।[২১১]

উয়াইস ﷀ ময়লার স্তূপ থেকে ভাঙা হাড্ডি জড়ো করতেন আর তাঁর আশপাশে কুকুররাও তা-ই করত। একবার এক কুকুর তাঁকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তিনি বললেন, "কুকুর, যে তোমার ক্ষতি করে না, তুমিও তার ক্ষতি করো না। তোমার কাছে যা আছে, তা তুমি খাও। আমার কাছে যা আছে, তা আমি খাই। আমি যদি জান্নাতে যাই, আমি তোমার চেয়ে উত্তম হব। আর আমি যদি জাহান্নামে যাই, তুমি আমার চেয়ে উত্তম হবে।"

ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﷀ গরিবদের সাথে শস্যের অঙ্কুর কুড়াতেন। যখন তিনি টের পেলেন গরিবরা তাদের সাথে তাঁর এ প্রতিযোগিতা পছন্দ করছে না, তখন তিনি ভাবলেন, "আমি কি বালখ অঞ্চলে সম্পদ ফেলে এলাম গরিবদের সাথে শস্যদানা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা করতে?" তারপর থেকে তিনি কেবল পশুরা যেসব মাঠে চড়ত, সেখান থেকেই শস্য কুড়াতেন।"

ইমাম আহমাদ ﷀ গরিবদের সাথে শস্য কুড়াতেন। সুফিয়ান আস-সাওরি ﷀ মক্কায় যাওয়ার পথে একবার দুটি উটের দেখাশোনার চাকরি নিয়েছিলেন। তিনি

---

[২১১] *বুখারি*: ৬৪৫২; আবু হুরায়রা ﷁ থেকে বর্ণিত।

কিছু লোকের জন্য রান্নার দায়িত্ব ছিলেন। তিনি এত বাজে রান্না করতেন যে, লোকেরা তা খেয়ে তাঁকে প্রহার করত। ফাতহুল মাওসিলি ﷺ টাকার বিনিময়ে কিছু মানুষের জন্য আগুন জ্বালানোর কাজ করতেন।

ভূমি দিয়ে এলাম আমি আপনার ওয়াস্তে
আমার শত্রু হিংসুকদের হস্তে।
হে রব, কতদিন পাব নেক নজর তোমার?
জীবন শেষ হতে চলল, প্রয়োজন ফুরোয়নি আমার।

আরেকজন সালাফ বলেছেন :

তোমার রহমতের খোঁজে
সয়েছি অনেক দুঃখ-যাতনা
অনেক ধৈর্য ধরেছি আমি
অনেক কষ্ট-যাতনা।
ছেড়ে যেয়ো না আমায়
পারব না আমি তোমায় ছাড়া
পারিশ্রমিক চাও যদি
আমার প্রাণটি নাও সারা।
তোমার সন্তুষ্টিকে আমি
বেসেছি অনেক ভালো,
হৃদয় আকুল, কণ্ঠ রুদ্ধ
অশ্রুতে টলোমলো।
আপনার প্রেমে সকল বিপদ
হয়ে যায় সহ্য আমার,
বিপদে যে কখনো পড়েনি
তার সুখ কী আবার?

তাঁদের দৃষ্টিতে দুনিয়াবি কষ্ট হলো নিয়ামাত। তাঁদের একজন বলতেন, "সত্যিকার বিচারক তো সে-ই, যে বিপদকে দেখে নিয়ামাত হিসেবে আর স্বাচ্ছন্দ্যকে ভাবে দুর্ভাগ্য।" এক ইসরাঈলী বর্ণনায় আছে, "যদি কোনো প্রাচুর্যশালীকে আসতে দেখো, তাহলে বলো, 'কোনো এক পাপের অগ্রীম শাস্তি!' যদি কোনো দরিদ্রকে আসতে দেখো, তাহলে বলো, 'নেককারের নিদর্শন, স্বাগতম!'"[২২০]

একজন সালাফ বলেছেন,

---

[২২০] যাহাবির মতে এটি বলেছেন সুরাইহ আল-কাদি, সিয়ার : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০৫

"আমি কোনো দুনিয়াবি বিপদে পড়লে চারবার আল্লাহর প্রশংসা করি। বিপদ এর চেয়েও খারাপ না হওয়ার কারণে, আমাকে বিপদ সহ্য করার শক্তি দেওয়ার কারণে, আমাকে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' বলার শক্তি প্রদানের কারণে, আমাকে দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো বিপদে না ফেলার কারণে।"

ধৈর্যের মাধ্যমে মুক্তি কামনা করা ইবাদাতের একটি প্রকার। কারণ, বিপদ কখনোই চিরস্থায়ী হয় না।

ধৈর্য ধরে বিপদ সহ্য করো, হে হৃদয়।
জেনো বিপদ কভু চিরস্থায়ী না হয়।
ধৈর্য ধরো মহান ব্যক্তিদের মতো করেই,
বিপদ তো আজকে আছে, কালকে নেই।

পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত লোকটিকে জান্নাতে একটু ঢুকিয়ে আবার বের করে এনে জিজ্ঞেস করা হবে, "তুমি কি কখনো বিপদ দেখেছ? বিপদ ভোগ করেছ?" সে বলবে, "না, ইয়া রব্ব!"[২২১]

হে আত্মা, আর মাত্র কয়েকটা দিন,
এরা তো স্বপ্নের মতো স্থায়িত্বহীন।
হে আত্মা, পৃথিবী তাড়াতাড়ি পার করে দাও,
আসল জীবন তো সামনে, তার দিকেই যাও।

আরেকজন বলেছেন :

একটি মাত্র ঘণ্টার ব্যাপার, তারপরই তা নেই,
এ সবই ক্ষণস্থায়ী, সব হারিয়ে শেষে যাবেই।

---

[২২১] *মুসলিম* : ২৮০৭; আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে।

অধ্যায় দশ
ধৈর্য ও বিজয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বিজয় রয়েছে ধৈর্যের মধ্যে।" কথাটি কুরআনের এ আয়াতের অনুরূপ :

"হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হবে, তখন অবিচল থাকবে আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো।"[২২২]

"...তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুই শ জনের উপর জয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে সেরূপ এক শ জন থাকলে তারা এক হাজার জনের উপর বিজয়ী হবে..."[২২৩]

তালূতের ঘটনার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

"তারপর তালূত ও তার সাথি মুমিনগণ নদী পার হয়ে বলল, 'আজ জালূত ও তার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই।' কিন্তু যাদের এ ধারণা ছিল যে, তাদের আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে, তারা বলল, 'আল্লাহর হুকুমে বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে।' আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[২২৪]

"হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তারা (অর্থাৎ শত্রুরা) মুহূর্তের মধ্যে এখানে তোমাদের উপর এসে পড়ে, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক বিশেষভাবে চিহ্নিত পাঁচ সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।"[২২৫]

এমন আরও অনেক আয়াত ও হাদীসে শত্রুর মোকাবেলার সময় ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

[২২২] সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৪৫

[২২৩] সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৬৫

[২২৪] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২৪৯

[২২৫] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১২৫

বানু আবাসার বয়োজ্যেষ্ঠদের উমার ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা শত্রুদের সাথে কী অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেন?" তারা বলল, "ধৈর্য দিয়ে। আমরা যতবারই কোনো শত্রুর মুখোমুখি হয়েছি, আমরা ধৈর্যশীল ও অবিচল ছিলাম যেমন ধৈর্যশীল ও অবিচল তারা ছিল।"

একজন সালাফ বলেছেন, "আমরা সবাই মৃত্যু ও আঘাতের ব্যথা ঘৃণা করি। কিন্তু ধৈর্যের মাধ্যমে আমাদের মর্যাদা (আল্লাহর কাছে) বিভিন্ন স্তরে বৃদ্ধি পায়।"

বাত্তাল ﷺ-কে সাহসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "এটা হলো এক ঘণ্টার ধৈর্য।"

এই সবকিছু বহিঃশত্রু বা কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও অন্তরের শত্রু তথা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও সত্য। এর বিরুদ্ধে লড়াই করা জিহাদের মহত্তম প্রকারগুলোর একটি। নবীজি ﷺ বলেন, "মুজাহিদ হলো সে, যে আল্লাহর জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।"[২২৬]

জিহাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা এক ব্যক্তিকে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ জবাব দিয়েছিলেন, "নিজের নফস দিয়ে শুরু করো আর এর বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিজের নফস দিয়ে শুরু করো আর এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করো।"

জাবির ﷺ থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত আছে, জিহাদ থেকে ফেরত আসা একটি দলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা ছোট যুদ্ধ থেকে বড় যুদ্ধের দিকে ফিরে এলে।" জিজ্ঞেস করা হলো, "বড় জিহাদ কী?" তিনি বলেন, "বান্দার নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা।"[২২৭]

---

[২২৬] আহমাদ : ২৩৯৫১; তিরমিযি : ১২৬১; ফাদালাহ থেকে বর্ণিত; আহমাদ : ২৩৯৫৭ এ এসেছে এই শব্দমালায়, "...আল্লাহর আনুগত্যের উপর।" সহীহ ইসনাদ সহকারে। আহমাদ : ২৩২৯৬৫ তে এসেছে এই শব্দমালায়, "...আল্লাহর রাস্তায়।" সহীহ ইসনাদ সহকারে। তিরমিযি : ১৬২১ এ এসেছে এই শব্দ সহকারে, "মুজাহিদ হলো সে, যে নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন।
তিরমিযি একে হাসান সহীহ বলেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন ইবনু হিব্বান : ৬৪২৪; হাকিম : ২৪; আলবানি, *আস-সহীহাহ* : ৫৪৯; এবং আরনাউত।

[২২৭] বায়হাকি, *আয-যুহদুল কাবির* : ৩৭৩ এ বলেন এর ইসনাদে দুর্বলতা আছে। ইবনু রজব একে যঈফ বলেছেন যেমনটি উপরে এসেছে, এ ছাড়া এসেছে জামিউল উলুম : খণ্ড ১, ৪৮৯ পৃষ্ঠায়। ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু আল-ফাতাওয়া* : খণ্ড ১১, ১৯৭ পৃষ্ঠায় বলেন এর কোনো ভিত্তি নেই। যায়লাই *তাখরিজুল কাশশাফ* : খণ্ড ২, ৩৯৫ পৃষ্ঠায় বলেন, এটি গারীব জিদ্দান। ইবনু হাজার, আল-কাফি : ১৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন, "এতে লাইস ইবনু আবু সুলাইম থেকে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ালা, তাঁর থেকে ঈসা *আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমু* : খণ্ড ১, ২২১ পৃষ্ঠায় বলেছেন এটি সহীহ নয়।

উমার -কে খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সময় আবু বকর বললেন, "প্রথম যে বিষয়ে আপনি সাবধান থাকবেন, তা হলো আপনার নফস।" সাইদ ইবনু সিনানের সূত্রে আনাস থেকে সহীহ সনদে এবং মালিক ইবনু আশজাই থেকে মুরসাল হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমার শত্রু সে নয়, যে তোমাকে হত্যা করলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো, অথবা তাকে তুমি হত্যা করলে সে তোমার জন্য নূর হয়। তোমার নিকৃষ্টতম শত্রু হলো তোমার অন্তরের কুপ্রবৃত্তি।"[২২৮]

কবি আব্বাস ইবনুল আহনাফ এক কবিতায় এই অর্থ তুলে এনেছেন :

আমার অন্তর আমাকে ক্ষতির দিকে ডাকে
বাড়িয়ে দেয় আমার যাতনা-দুঃখবোধ,
যে শত্রু আমার ভেতরেই বাস করে,
তাকে কীভাবে করি প্রতিরোধ?

এই জিহাদেও ধৈর্য প্রয়োজন। যে কেউ ধৈর্যধারণ করে নিজের বিরুদ্ধে, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ও নিজের শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে বিজয়ী হবে। উল্টোদিকে যে হাল ছেড়ে দেয়, সে পরাজিত ও বন্দী হবে। সে হয়ে পড়বে তার শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির অধীনস্থ। বলা হয় :

মানুষ যদি কুপ্রবৃত্তিকে না হারায়
মহৎ ব্যক্তিও নিকৃষ্ট হয়ে যায়।

আরেকজন বলেন :

কামনার হাতে হয়তো বন্দী থাকে কেউ
তবুও ধৈর্যের মুখে হারিয়ে যায় তা,
বাসনার কাছে হয়তো হয়েছে কেউ দাস
কিন্তু তা দমন করে সেও হতে পারে রাজা।

ইবনু ইবরাহীম রয়েছেন, যাদের সকলে যঈফ। আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ২৪৬০ এ একে মুনকার বলেছেন।

মোল্লা আলি কারি, *আল-আসরারুল মারফুআহ* : ২২১ এ ইবনু হাজারের উদ্ধৃতি দেন যে, এটি ইবরাহীম ইবনু আবু আবলাহর একটি উক্তি। এ ছাড়া লেখক, *জামিউল উলুম* : খণ্ড ১, ৪৮৯ পৃষ্ঠাতেও একে তাঁর উক্তি বলেছেন।

[২২৮] তাবারানি, *আল-কাবির* : ৩৪৪৫; আবু মালিক আল-আশআরি থেকে বর্ণিত; আলবানি একে যঈফ বলেছেন, *যঈফুত তারগীব* : ১৮৯০

ইবনুল মুবারাক বলেন, "ধৈর্যশীলদের শেষ পর্যন্ত খুব অল্পই ধৈর্য ধরা লাগে। আর যারা হতাশ হয়ে যায়, তারা সামান্যই আনন্দের খোরাক পায়।"

বুখারি ও *মুসলিমে* বর্ণিত আছে নবীজি ﷺ বলেন, "শক্তিশালী সে নয়, যে ভালো কুস্তি করে। আসল শক্তিশালী হলো সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।"[২২৯]

> আহনাফ ইবনু কায়স ﷬-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে এক ব্যক্তি বলেন, "রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে তাঁর ছিল অভাবনীয় দক্ষতা।" এক ব্যক্তি এক সালাফকে বললেন, "অমুক পানির উপর হাঁটতে পারে।" তিনি তা শুনে বললেন, "আল্লাহ্ যদি কাউকে তার প্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতা দেন, সে পানির উপর হাঁটতে জানা ব্যক্তির চেয়েও শক্তিশালী।"

জেনে রাখুন, আপনার প্রবৃত্তি হলো একটি পশুর মতো। সে যদি দেখে আপনি দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞ, তাহলে সে নড়াচড়া করে না। কিন্তু যদি সে দেখে আপনি অলস, তাহলে সে এর সুযোগ নিয়ে নিজের কামনা-বাসনার পেছনে ছুটতে শুরু করে।

আবু সুলাইমান আদ-দারানি ﷬ বলতেন, "যখন আমি ইরাকে ছিলাম, তখন আমি রাজপুত্রদের প্রাসাদ, পাত্র, জামাকাপড় ও খাবারের দেখভালের দায়িত্বে ছিলাম। আমার নফস এর কোনোটিই কামনা করেনি। তারপর আমাকে খেজুরের স্তূপ দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হলে আমি প্রায় এর ফাঁদে পড়েই যাচ্ছিলাম।" এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে তা জানানো হলে তিনি বলেন, "প্রথমটি অর্জন করার কোনো ইচ্ছা বা আশা তার ছিল না, তাই তার প্রবৃত্তি তার পেছনে ছোটেনি। কিন্তু সে দ্বিতীয়টি চাইছিল, তাই তার প্রবৃত্তি ছুটতে শুরু করে।"

> **শক্ত হাতে বিলাসিতা দূরে ঠেললাম**
> **যতক্ষণ না তারা দূর হয়ে গেল,**
> **নফসকে জোর করলাম সেসব ছাড়তে**
> **সে তা মেনে নিতে বাধ্য হলো।**
> **মানুষ যেদিকে নির্দেশ করে**
> **নফস তো সেদিকেই যায়,**
> **শুধু সুযোগ পেলেই কেবল**
> **সে কামনার দিকে ধায়।**

---

[২২৯] *বুখারি* : ৬১১৪; *মুসলিম* : ২৬০৮; আবু হুরায়রা ﷜ থেকে বর্ণিত।

অনেক দিন যাবৎ আমার নফস
হয়েছে আমার উপর বিজয়ী
কিন্তু যখনই দৃঢ় হয়েছি আমি
নফস হয়েছে বিনয়ী।

অতএব, "বিজয় রয়েছে ধৈর্যের মধ্যে" বলার দ্বারা বাইরের ও ভেতরের উভয় ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলা হচ্ছে। সালাফগণ নফসের কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে ধৈর্যধারণ করাকে বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করার চেয়ে উত্তম বলে জানতেন।

মায়মুন ইবনে মিহরান ﵀ বলেন,

> "ধৈর্য দুই ধরনের। বিপদের মুখে ধৈর্যধারণ করা, যা ভালো। আর গুনাহ পরিত্যাগ করতে ধৈর্যধারণ করা, যা উত্তম।"

সাইদ ইবনু যুবাইর ﵀ বলেন,

> "ধৈর্য দুই ধরনের। শ্রেষ্ঠ ধৈর্য হলো আল্লাহর নিষেধকৃত জিনিস পরিহার করতে ও তাঁর আদেশকৃত কাজ করতে ধৈর্যধারণ করা। অপরটি হলো বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা।"

একই অর্থবিশিষ্ট রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীস আলি ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবে তা সহীহ নয়।[২৩০]

---

২৩০ ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আস-সবর* : ২৪ এই শব্দমালায়, "ধৈর্য তিন ধরনের। বিপদ মোকাবেলায় ধৈর্য, আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য, গুনাহ পরিহারে ধৈর্য..."

অধ্যায় এগারো

কষ্টের সাথে স্বস্তি

নবীজি ﷺ বলেন, "কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।" এর সমর্থন রয়েছে আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতে :

"মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন আর স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই সকল গুণে প্রশংসিত প্রকৃত অভিভাবক।"[২৩১]

"আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালার সঞ্চার করেন, অতঃপর তিনি তা আকাশে ছড়িয়ে দেন যেভাবে ইচ্ছে করেন, অতঃপর তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মাঝ থেকে বৃষ্টিফোঁটা নির্গত হচ্ছে, অতঃপর তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট তিনি ইচ্ছে করেন তাদের কাছে যখন তা পৌঁছে দেন, তখন তারা হয় আনন্দিত। যদিও ইতঃপূর্বে তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তারা ছিল চরমভাবে হতাশ।"[২৩২]

আবু রাযিন আল-উকাইলি ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, নবীজি ﷺ বলেন, "আমাদের রব সেই বান্দার হতাশা দেখে হাসেন, যার অবস্থা তিনি শীঘ্রই পরিবর্তন করতে চলেছেন।"[২৩৩] ইমাম আহমাদ ﷺ এটি বর্ণনা করেন। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ﷺ-ও আবু রাজিন ﷺ-এর সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যেখানে নবীজি ﷺ বলেন, "যেই দিনে বৃষ্টি পাঠানো হবে, আল্লাহ তোমাদের হতাশ অবস্থায় দেখবেন এবং তিনি হাসবেন এটি জেনে যে, তিনি শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন আনতে চলেছেন।"[২৩৪]

---

[২৩১] সূরাহ আশ-শুরা, ৪২ : ২৮

[২৩২] সূরাহ আর-রূম, ৩০ : ৪৮-৪৯

[২৩৩] আহমাদ : ১৬১৮৭-১৬২০১; ইবনু মাজাহ : ১৮১; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, *আস-সুন্নাহ* : ৪৫২-৪৫৩; ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আল-ওয়াসিতিয়্যাহ*তে বলেন, হাদীসটি হাসান। সুয়ুতি, *আল-জামি* : ৫২০৭ এ একে সহীহ বলেছেন। আরনাউত এর ইসনাদ যঈফ বলেছেন। একই কথা বলেছেন আলবানি, *আস-সহীহাহ* : ২৮১০, কিন্তু তিনি একে শাহীদের কারণে হাসান বলেছেন।

[২৩৪] আহমাদ : ১৬২০৬; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, *আস-সুন্নাহ* : ৪৫২-৪৫৩; তাবারানি, *আল-কাবির* : খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ২১১, হাদীস নং ৪৭৭, এর ইসনাদ যঈফ; অনুরূপ আলবানি, *আস-সহীহাহ* : ২৮১০; এবং আরনাউত

এর অর্থ হলো আল্লাহ তাঁর বান্দার হতাশা, নিরাশা, ভয়, ভুল বোঝা ও তাঁর রহমতের আশা ছেড়ে দেওয়া দেখে বিস্মিত হন, অথচ তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন যে, তাদের অজান্তেই অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্তিত হবে, বৃষ্টি নেমে আসবে।

এক জুমু'আর দিন নবীজি ﷺ যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, এক ব্যক্তি এসে খরা ও জনগণের দুর্দশার ব্যাপারে অভিযোগ করল। নবীজি ﷺ হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। আকাশে মেঘ জমে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে লাগল। তখন লোকেরা এসে বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করতে অনুরোধ করল। এরপর আকাশ পরিষ্কার হলো।[২৩৫]

আল্লাহ তাঁর কিতাবে এমন অনেক কাহিনি বলেছেন যেখানে দুঃখ-দুর্দশার পর প্রশান্তি আসে। তিনি নূহ ﵇-এর কথা বলেছেন, যাকে তাঁর সাথের মুমিনদের সহ আল্লাহ 'মহাবিপদ' থেকে উদ্ধার করেছেন, যখন বাকি সবাই ডুবে গিয়েছিল।[২৩৬] আল্লাহ জানিয়েছেন কীভাবে তিনি মুশরিকদের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে ইবরাহীম ﵇-কে উদ্ধার করেছেন এবং তাকে তাঁর জন্য 'প্রশান্তিদায়ক ঠান্ডা' করে দিয়েছেন।[২৩৭] আরও বলেছেন ইবরাহীম ﵇ তাঁর সন্তানকে কুরবানি করার শেষ মুহূর্তে এক 'উত্তম কুরবানি'র[২৩৮] বিনিময়ে ইসমাঈল ﵇-এর প্রাণ বাঁচান। তিনি জানিয়েছেন কীভাবে মূসা ﵇-কে তাঁর মা নদীতে ভাসিয়ে দেন এবং তিনি ফিরআউনের পরিবারের কাছে এসে ভিড়েন। আরও জানিয়েছেন মূসা ﵇ ও ফিরআউনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কাহিনি, কীভাবে আল্লাহ মূসা ﵇-কে বাঁচিয়ে তাঁর শত্রুদের ডুবিয়ে দেন। তিনি আইয়ুব ﵇, ইউনুস ﵇, ইয়াকুব ﵇, ইউসুফ ﵇-এর কাহিনি বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ﵇-এর জনপদ ঈমান আনার পর কী হলো, তা বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। গারে সাওর এবং বদর, উহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে কীভাবে সাহায্য করেছেন, তা জানিয়েছেন।

---

[২৩৫] *বুখারি* : ৯৩২-৯৩৩-১০১৩-১০১৯-১০২১-১০২৯-১০৩৩-৩৫৮২-৬০৯৩-৬৩৪২; *মুসলিম* : ৮৯৭; আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত।
[২৩৬] সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ৭৬
[২৩৭] সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ৬৯
[২৩৮] সূরাহ আস-সফফাত, ৩৭ : ১০৭

আয়িশা ﷺ-কে লোকেরা মিথ্যা অপবাদ প্রদানের পর আল্লাহ্ তাঁর নিষ্পাপতা ঘোষণা করেছেন।[২৩৯] আল্লাহ্ আরও জানিয়েছেন তিন ব্যক্তির কাহিনি :

> **"...যারা (তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে) পেছনে থেকে গিয়েছিল। তারা অনুশোচনার আগুনে এমনই দগ্ধ যে, পৃথিবী তার পূর্ণ বিস্তৃতি নিয়েও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল আর তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো আশ্রয়স্থল নেই তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া ব্যতীত। অতঃপর তিনি তাদের অনুগ্রহ করলেন, যাতে তারা অনুশোচনায় তার দিকে ফিরে আসে..."**[২৪০]

সুন্নাহয়ও এমন অনেক কাহিনি আছে। যেমন গুহায় আটকা পড়া তিন ব্যক্তি, যারা নিজেদের আমলের দোহাই দিয়ে দু'আ করে মুক্তি পান।[২৪১] আরও আছে ইবরাহীম ﷺ ও সারাহ ﷺ-এর কাহিনি, যেখানে যালিম বাদশাহ তাঁদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে বন্দী করে কিন্তু আল্লাহ তার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন।[২৪২]

উম্মাতে মুহাম্মাদী এবং এর আগের উম্মাতদের এমন অনেক কাহিনি বিবৃত হয়েছে অনেক কিতাবে। যেমন : ইবনু আবিদ্দুনিয়া ﷺ *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ, মুজাবিউদ্দু'আ* এবং আরেকটি কিতাব *আল-মুস্তাগিসিনা বিল্লাহ ওয়াল মুস্তাস্রিখিনা বিহি*, এ ছাড়া আওলিয়াগণের কারামাত-সংক্রান্ত কিতাব, সৎকর্মশীলদের জীবনী ও ইতিহাসের কিতাব।

একজন আলিম–সম্ভবত তিনি মরোক্কোর, তাঁর এক বইয়ে হাফিয আবু যার আল-হারাওয়ি ﷺ থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি যখন বাগদাদে এক সুগন্ধী বিক্রেতার দোকানে আবু হাফস ইবনু শাহিন ﷺ-কে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তিনি

---

[২৩৯] পুরো কাহিনিটি বর্ণিত আছে *বুখারি* : ২৬৬১-৪১৪১-৪৬৯০-৪৭৫০-৪৭৫৭-৬৬৭৯-৭৩৬৯-৭৩৭০-৭৫০০-৭৫৪৫ এবং *মুসলিম* : ২৭৭০; আয়িশাহ ﷺ থেকে।

[২৪০] সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ১১৮

পুরো কাহিনিটি বর্ণিত আছে *বুখারি* : ২৭৫৭-২৯৪৭-২৯৫০-৩০৮৮-৩৫৫৬-৩৮৮৯-৩৯৫১-৪৪১৭-৪৬৭৩-৪৬৭৬-৪৬৭৭-৪৬৭৮-৬২৫৫-৬৬৯০-৭২২৫ এবং *মুসলিম* : ২৭৬৯; কাব বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত।

[২৪১] *বুখারি* : ২২১৫-২২৭২-২৩৩৩-৩৪৬৫-৫৯৭৪ এবং *মুসলিম* : ২৭৪৩; ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত।

[২৪২] *বুখারি* : ২২১৭-২৬৩৫-৩৩৫৭-৩৩৫৮-৫০৮৪-৬৯৫০; *মুসলিম* : ২৩৭১; আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত।

এক লোককে এসে দশ দিরহাম দিয়ে সুগন্ধী বিক্রেতার কাছ থেকে কিছু কিনতে দেখলেন। সে ক্রয়কৃত জিনিসগুলো একটি টুকরিতে রেখে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সে পড়ে গিয়ে সব জিনিস ভেঙে গেল। লোকটি কান্না করতে করতে জানাল যে, সে একবার এক কাফেলায় উট ও তার পিঠে থাকা চার শ দিরহাম এবং তার চেয়েও দামি কিছু রত্নপাথর হারায়। তাতেও সে কিছু মনে করেনি। কিন্তু এখন তার ছেলে হয়েছে। প্রসবের পর নারীর যা যা লাগে, তা সে কিনে ফিরছিল। এই দশ দিরহামই তার ছিল। এখন তাও শেষ। পরের দিন তার কোনো কাজও নেই যে অর্থ কামাই করবে। এখন সে কেবল পালিয়ে গিয়ে স্ত্রী-সন্তানকে শান্তিতে মরতে দিতে পারে। আল-জুন্দের এক বয়স্ক লোক ঘরের দাওয়ায় বসে তা শুনতে পেলেন। তিনি কয়েকজন সহকর্মীসহ অনুমতি নিয়ে আবু হাফস ﵀-এর ঘরে এলেন। বিপদে পড়া লোকটিও তাঁদের সাথে ছিল। তিনি লোকটিকে তার কাহিনি আবার শোনাতে বলেন। এরপর জিজ্ঞেস করেন তার হারানো উটটি দেখলে সে চিনবে কি না। সে জানাল চিনবে। তিনি একটি উট এনে দিলে লোকটি তা চিনতে পারে এবং তার সাথে থাকা রত্নপাথরগুলোও সাথে পায়। ফলে সে আবার ধনী হয়ে ফিরে গেল। সে চলে যাবার পর জুন্দী লোকটি কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন, "আমি দু'আ করেছিলাম উটের মালিককে খুঁজে পাবার আগ পর্যন্ত যেন আমি বেঁচে থাকি। আজ যেহেতু আমার সে দু'আ কবুল হয়ে গেছে, আমি বুঝতে পারছি আমার মৃত্যু নিকটবর্তী।" আবু যার ﵀ জানান, "তিনি অল্প ক'দিন পরই মারা যান। আমরা তাঁর জানাযা আদায় করি। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।"

একই লেখক আরেকটি কাহিনি বর্ণনা করেন। মওসুলে এক ব্যবসায়ী ছিল, যে নানা জায়গায় ঘুরেফিরে ব্যবসা করত। একবার সকল সহায়সম্পত্তি ও ব্যবসায়িক মালামাল নিয়ে সে কুফায় ব্যবসা করতে গেল। পথে এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো যে তার অনেক উপকার করল। তারা দ্রুত বন্ধু হয় গেল এবং সে তাকে বিশ্বাস করে বসল। এক জায়গায় বিশ্রাম নিতে থামলে ওই ব্যক্তি সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীর সবকিছু নিয়ে যায়। ব্যবসায়ী একদম কপর্দকশূন্য হয়ে যায়। সে অনেক খুঁজেও চোরকে খুঁজে পেল না। পায়ে হেঁটে ধুঁকে ধুঁকে সে নিজ দেশে ফিরল। তার পরিবার তাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল। তার স্ত্রী এক সন্তানের জন্ম দিয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, জ্বালানি ও খাবার কিছুই ঘরে নেই। তারা ভেবেছিল সে ফিরে আসায় এখন সেসবের ব্যবস্থা হবে। এই ঘটনা শুনে ব্যবসায়ীর কষ্ট আরও বেড়ে গেল। কিছু না জানিয়ে সে বাজারের দিকে গেল। দোকানদারকে সালাম দিয়ে সে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জড়ো করে কিছু বলতে যাবে, এমন সময় দোকানদারের কাছে অরক্ষিত অবস্থায় সে তার ঘোড়ায় ঝোলানোর থলিটি পড়ে থাকতে দেখতে

পেল। সে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল এই জিনিস সে কোথায় পেয়েছে। দোকানদার জানাল এক ব্যক্তি সফর করে এসে তার কাছে এগুলো আমানত রেখেছে। সে মাসজিদে ঘুমোচ্ছে। ব্যবসায়ী থলিটি নিয়ে মাসজিদে গিয়ে সেই লোককে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখল। সে তাকে লাথি মেরে জাগিয়ে দিয়ে বলল, "চোর! বিশ্বাসঘাতক! আমার জিনিসপত্র কোথায়?" চোরটি জানাল তার সেই থলিতেই সব আছে। ব্যবসায়ী তখন থলি খুলে তাতে নিজের সকল জিনিস খুঁজে পেল। সে তারপর তার পরিবারের জন্য দুই হাত খুলে খরচ করল।

একই রকম একটি দীর্ঘ কাহিনি তিন্নাওখি ﷺ বর্ণনা করেছেন *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ* গ্রন্থে। এর সারসংক্ষেপ হলো : খলিফা হারুন আর-রশিদের আমলে এক টাকা লেনদেনকারী ছিল। সে পাঁচ শ দিনার দিয়ে এক দাসী ক্রয় করল। সে দাসীকে এতই ভালোবেসে ফেলল যে, সব সময় তার সাথে থাকতে থাকতে তার ব্যবসায় ক্ষতি হওয়া শুরু হলো। তার পুরো মূলধন খরচ হয়ে গিয়ে কিছুই বাকি থাকল না। তার দাসী গর্ভবতী হয়ে গেল। লোকটি তার ঘরের জিনিসপত্র বেচতে বেচতে শেষ পর্যন্ত আর কিছুই বাকি রইল না। প্রসববেদনা উঠলে নারীটি তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে তাড়া দিলো। বলল যে, সেগুলো যথাসময়ে না পেলে সে মারা যাবে। লোকটি ঘর থেকে বের হয়ে ফুরাত নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। শেষ মুহূর্তে তাকে আল্লাহর ভয় পেয়ে বসল। সে আত্মহত্যার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে পায়ে হেঁটে এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতে লাগল। শেষমেশ সে খুরাসানে পৌঁছে কাজ পেল। সে সেখান থেকে বাগদাদে তার দাসীর কাছে পর পর ছেষট্টিটি চিঠি লিখেও কোনো জবাব পেল না। সে ধরে নিল তার দাসী সত্যিই মারা গেছে। ত্রিশ বছর খুরাসানে থেকে সে আবারও ধনী হয়ে গেল। তখন সে বাগদাদে নিজ ভূমে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। পথিমধ্যে ডাকাতি হয়ে সে আবার আগের মতো কপর্দকহীন হয়ে গেল। বাগদাদে ফিরে সে নিজের ঘরের ঠিকানায় গিয়ে দেখল সেখানে আলিশান এক বাড়ি। তাতে পাহারাদার দাঁড় করানো। সে প্রহরীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই ঘরের মালিক কে? প্রহরী জানাল একজন টাকা লেনদেনকারী এ ঘরের মালিক। যে নাম তাকে বলা হলো, তা তার নিজেরই নাম। আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে প্রহরী বলল যে, এই ঘরের মালিকের মা হলেন আমীরুল মুমিনীনের ছেলেরও ধাত্রী মাতা। আমীরুল মুমিনীনের মামুন নামে এক ছেলে হয়। সে এই মহিলা ছাড়া আর কারও দুধ খেতে চাইত না। মামুন যখন খলিফা হলেন, তিনি সেই মহিলাকে আর তার ছেলেকে যত্ন-আত্তি করেন। ছেলেটি বড় হলে খলিফা তাকে বাইতুল মালের রক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। সেই মহিলা এখন কিছুদিন খলিফার কাছে থাকে, আর কিছুদিন এই বাড়িতে নিজের ছেলের কাছে থাকে। প্রহরীর কাছে সে এই মহিলার স্বামীর

ব্যাপারে জানতে চাইলো। প্রহরী জানাল, ত্রিশ বছর আগে এই বাড়ির মালিকের যখন জন্ম হচ্ছিল তখন তার বাবা অর্থের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর পথ হারিয়ে ফেলে। সে আর ফিরে আসেনি, হয়তো মারা গেছে। তাদের কথোপকথনের পর নিজের লোকজনসহ তার ছেলে ফিরে আসে। লোকটি তাকে পরিচয় দিয়ে বলে সে তার বাবা। ছেলেটি বিস্মিত হয়ে যায়। তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে বসায়। সেখানে একটি পর্দাঘেরা জায়গা ছিল। লোকটি বলল, "তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।" কথা শুনে সেই দাসীটি বেরিয়ে এসে নিজের স্বামীকে চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে কাঁদতে লাগল। তারা তাকে আমীরুল মুমিনীনের কাছে নিয়ে গেল। খলিফা আল-মামুন তার ছেলেকে পদোন্নতি দিলেন আর তাকে তার ছেলের আগের পদে নিয়োগ দিলেন।

ইবনু আবিদ্দুনিয়া ﵀ তাঁর *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ওয়াদ্দাহ ইবনু খাইসামা বলেন, "উমার বিন আব্দুল আযীয ﵀ আমাকে এক কারাগার থেকে সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিলেন। আমি ইয়াযিদ ইবনু আবি মুসলিম ছাড়া বাকি সবাইকে ছেড়ে দিলাম। সে প্রতিশোধ হিসেবে আমার প্রাণ নেওয়ার হুমকি দিলো। আমি আফ্রিকায় থাকা অবস্থায় শুনলাম আফ্রিকান প্রদেশগুলোর সম্প্রতি নিযুক্ত আমির ইয়াযিদ ইবনু আবি মুসলিম আসছে। আমি পালিয়ে গেলাম। সে আমাকে ধরতে একের পর এক লোক পাঠাতে লাগল। একসময় আমি ধরা পড়লাম আর আমাকে তার কাছে নেওয়া হলো। সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি বারবার দু'আ করেছি তোমাকে আমার কাছে পাওয়ার জন্য।' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি বারবার দু'আ করেছি তিনি যেন তোমার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করেন।' সে বলল, 'আল্লাহর কসম! তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দেননি আর আমি তোমাকে হত্যা করব। এমনকি মৃত্যুর ফেরেশতাও যদি তোমার প্রাণ নিতে আমার সাথে পাল্লা দেন, তিনি পরাজিত হবেন। তরবারি আর জল্লাদের চাদর নিয়ে এসো!' আমাকে তাতে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে আমার মাথায় জল্লাদ তলোয়ার ঠেকাল। এমন সময় সালাতের আযান হলো। সে সালাত পড়তে চলে গেল। সে সেজদায় থাকা অবস্থায় একদল সেনা আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলল। এক লোক এসে আমার হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে আমাকে নিজের রাস্তায় চলে যেতে বলল।"

উমার আস-সারায়ার সূত্রে তিনি আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। উমার একবার রোমান প্রদেশগুলোতে একাকী অবস্থান করছিলেন। তিনি ঘুমানো অবস্থায় তাদের একজন এসে তাঁকে পাড়া দিয়ে ঘুম থেকে তুলে বলল, "অ্যাই আরব, তোমাকে

বেছে নেওয়ার সুযোগ দিলাম। তোমাকে আমি বর্শা দিয়ে হত্যা করতে পারি, তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে পারি অথবা আমরা কুস্তি করতে পারি।" তিনি বললেন, "তাহলে আমরা কুস্তি লড়ব।" সে তাঁকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর বসে বলল, "বল, তোকে কীভাবে হত্যা করব।" তিনি চিৎকার করলেন, "হে আল্লাহ, আপনার মহত্ত্ব ছাড়া আপনার আরশের নিচের আর যা কিছুর ইবাদাত করা হয়, সব মিথ্যে! আপনি আমার অবস্থা দেখছেন। অতএব আমাকে উদ্ধার করুন।" তিনি তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন তিনি ওই রোমানকে তাঁর পাশে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন।

আবুল হাসান ইবনু জাদহাম ﷺ বর্ণনা করেন, হাতিম আল-আসাম ﷺ বলেন, "আমরা তুর্কিদের মুখোমুখি হলাম এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। এক তুর্কি আমাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলো। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে এসে আমার বুকে চড়ে বসল। আমার দাড়ি ধরে সে নিজের মোজা থেকে একটি চাকু বের করে আমাকে জবাই করতে উদ্যত হলো। কিন্তু আমার হৃদয় তার বা তার চাকুতে মগ্ন ছিল না। তা মগ্ন ছিল আমার মালিকের মাঝে। আমি ভাবলাম, 'হে মালিক, আপনি যদি এখানে আমার জবাই তাকদীরে রেখে থাকেন, আমি এর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করলাম। আমি আপনারই।' এমতাবস্থায় এক মুসলিম তার দিকে একটি তির ছুড়ে মারল আর সে আমার উপর থেকে পড়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার চাকু নিয়ে তাকে জবাই করে দিলাম।"

অতএব, আপনার হৃদয়কে আপনার মনিবের হাতে সঁপে দিন। দেখবেন সাহায্যের এমন সব দুয়ার খুলে যাচ্ছে, যা আপনার পূর্বপুরুষদের কেউ দেখেনি।

এ রকম অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তবে আমরা যা উল্লেখ করলাম, ততটুকুই যথেষ্ট।

অধ্যায় বারো

কাঠিন্যের সাথে সহজতা

রাসূল ﷺ বলেন, "আর কাঠিন্যের সাথে আছে সহজতা।" এ কথাটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই আয়াত থেকে উৎসারিত :

"আল্লাহ্ কষ্টের পর আরাম দেবেন।"[২৪৩]

"কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।"[২৪৪]

হুমাইদ ইবনু হাম্মাদ ইবনু আবুল খুওয়ার ﷺ বর্ণনা করেন, আইয ইবনু শুরাইহ ﷺ তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আনাস বিন মালিক ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "নবীজি ﷺ মাটিতে এক গর্তের সামনে বসে ছিলেন। তিনি বললেন, 'কষ্ট যদি এই গর্তে গিয়েও ঢুকত, স্বস্তি এর পেছন পেছন গিয়ে ঢুকে তাকে বের করে দিত।' তারপর আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করেন :

"কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।"[২৪৫]

এটি বর্ণিত হয়েছে ইবনু আবি হাতিম ﷺ-এর *আত-তাফসিরে*। বাযযার ﷺ-এর বর্ণনায় রয়েছে, "কষ্ট যদি এসে এই গর্তেও ঢুকত, স্বস্তি এর পেছন পেছন গিয়ে ঢুকত এবং একে সরিয়ে দিত। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, 'কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।'"[২৪৬]

হুমাইদ বিন হাম্মাদকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলা হয়। মা'মার ﷺ থেকে ইবনু জারির ﷺ বর্ণনা করেন, আল-হাসান বলেন, "নবীজি ﷺ একদিন আনন্দিত ও খুশি

---

[২৪৩] সূরাহ আত-তলাক, ৬৫ : ৭

[২৪৪] সূরাহ আলাম নাশরহ, ৯৪ : ৫-৬

[২৪৫] সূরাহ আলাম নাশরহ, ৯৪ : ৫-৬

[২৪৬] ইবনু আবি হাতিম : ১৯৩৯৫; বাযযার : ২২৮৮; তাবারানি, *আল-আসওয়াত* : ৩৪১৬; হাকিম : ৩০১০। যাহাবি বলেন, "এটি শুধু হুমাইদ ইবনু হাম্মাদ থেকে আইয সূত্রে বর্ণিত আছে। উভয়ই হাদীস বর্ণনায় মুনকার। বায়হাকি, *শুয়াব* : ১০০১২, বলেন এটি যঈফ; আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ১৪০৩ এ একে যঈফ জিদ্দান বলেছেন।

অবস্থায় বের হয়ে এসে বললেন, 'একটি কষ্ট কখনো দুইটি স্বস্তিকে গ্রাস করতে পারবে না।'"[২৪৭]

"কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।"[২৪৮]

আওফ ﷺ এবং ইউনুস ﷺ-এর সূত্রেও তিনি আল-হাসান থেকে এটি মুরসাল হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি একে কাতাদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস হিসেবেও উল্লেখ করেছেন, যিনি বলেন, "আমাদের কাছে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে এই আয়াতের সুসংবাদ এই বলে দিয়েছেন যে, 'একটি কষ্ট কখনো দুইটি স্বস্তিকে গ্রাস করতে পারবে না।'"[২৪৯]

মুয়াউয়িয়াহ ইবনু কুররাহ ﷺ থেকে ইবনু আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, এক বর্ণনাকারী তাঁকে জানিয়েছেন, ইবনু মাসউদ ﷺ বলেছেন, "কষ্ট যদি একটি গর্তেও প্রবেশ করে, স্বস্তি একে অনুসরণ করে এতে প্রবেশ করবে।"[২৫০] তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

"কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।"[২৫১]

এ ছাড়া তিনি এটি আব্দুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর বাবার থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবু উবাইদা ﷺ অবরোধে পড়লেন, তখন উমার ﷺ তাঁকে চিঠি লিখলেন, "যে কষ্টই

---

[২৪৭] তাবারি; বায়হাকি, *শুয়াব* : ১০০১৩; হাকিম : ৩৯৫০; যাহাবি একে মুরসাল বলেন। একই কথা বলেছেন যায়লাই, *তাখরিজুল কাশশাফ* : খণ্ড ৪, ২৩৫ পৃষ্ঠায়। ইবনু হাজার, *আল-কাফি* : ৩১৯ পৃষ্ঠায় একে মুরসাল বলেন এবং বলেন যে, এর মাওসুল সংস্করণটি যঈফ। *তাগলিক আত-তালিক* : খণ্ড ৪, ৩৭২ পৃষ্ঠায় তিনি আরও বলেন আল-হাসান পর্যন্ত এর ইসনাদ সহীহ। আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ৪৩৪২ এ একে যঈফ বলেন।
ইবনু আবি হাতিম : ১৩৩৯৬ এ একে আল-হাসানের উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন।
ইবনু কাসির বলেন, "এই কথাগুলোর অর্থ হলো উভয় ক্ষেত্রে 'কষ্ট' কথাটি সুনির্দিষ্টতাবাচক উপসর্গ 'আল' এর সাথে যুক্ত। অতএব এটি একবচন। কিন্তু 'স্বস্তি' শব্দটি অনির্দিষ্ট রেখে দেওয়া হয়েছে। অতএব, এটি একাধিকবার ঘটবে। অতএব, দ্বিতীয়বারে উল্লেখিত কষ্ট প্রথমটিকেই বোঝাচ্ছে। তবে স্বস্তির ঘটনা একাধিক।"
[২৪৮] সূরাহ আলাম নাশরহ, ৯৪ : ৫-৬
[২৪৯] তাবারি; এটি মুরসাল। ইবনু হাজার, *তাগলিক আত-তালিক* : খণ্ড ৪, ৩৭২ পৃষ্ঠায় বলেন কাতাদাহ পর্যন্ত এর ইসনাদ সহীহ।
[২৫০] বায়হাকি, *শুয়াব* : ১০০১১; সুয়ুতি, *আদুররুল মানসুরে* একে ইবনু আবিদ্দুনিয়ার *আস-সবরের* সাথে সম্পৃক্ত করেন।
[২৫১] সূরাহ আলাম নাশরহ, ৯৪ : ৫-৬

আসুক না কেন, আল্লাহ তার পর মুক্তি পাঠাবেন। কারণ, একটি কষ্ট দুটি স্বস্তিকে গ্রাস করতে পারে না আর আল্লাহ বলেন :

> **'হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধরো এবং ধৈর্যে (শত্রুর চেয়ে বেশি) অগ্রসর থাকো। যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদর্শন করো। আর তাকওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'**[২৫২, ২৫৩]

ইবনে আব্বাস[২৫৪] رضي الله عنه সহ অন্যান্য মুফাসসিরগণও এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "একটি কষ্ট দুইটি স্বস্তিকে গ্রাস করতে পারবে না।"

অতীতের এক ব্যক্তি মরুভূমিতে খুব কষ্টে থাকা অবস্থায় কবিতার এ চরণ দুটি তাঁর মাথায় আসে :

> **দুশ্চিন্তিত হয়ে নিদ্রা থেকে জাগরণ,**
> **তার চেয়ে উত্তম হলো সাক্ষাৎ মরণ।**
> **রাতের বেলা কোনো একটি কণ্ঠ ডেকে উঠল,**
> **নিশ্চিন্ত হও, হে দুশ্চিন্তিত জন!**
> **কবিতা আওড়েছ, কিন্তু সাক্ষ্য দেয় মন,**
> **ধেয়ে আসে যখন কষ্টের বাহিনী**
> **ভাবো, 'আমি কি প্রশস্ত করিনি...?'**[২৫৫]
> **দুই স্বস্তির মাঝে এক কষ্ট থাকবেই**
> **স্মরণ করলে আনন্দ লাগবেই।**

তিনি বলেন, "আমি এই চরণগুলো মুখস্থ করে নিলাম। আর আল্লাহ আমাকে আমার দুর্দশা থেকে মুক্তি দিলেন।"

এ ব্যাপারে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। আমরা এর কয়েকটি উদ্ধৃত করছি :

> **ধৈর্য ধরো, ধৈর্যে বিস্ময়কর ফল আসে,**
> **হতাশ হোয়ো না কোনোই সর্বনাশে।**

---

[২৫২] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ২০০

[২৫৩] ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ : পৃষ্ঠা ২৪; বায়হাকি, *শুয়াব* : ১০০১০; ইবনু আবি শাইবাহ : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৩৫ এবং খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৭; হাকিম : ৩১৭৬ এ একে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। যাহাবি একমত। কিন্তু ইবনু হাজার, *তাগলিক আত-তালিক* : খণ্ড ৪, ৩৭২ পৃষ্ঠায় বলেন এর ইসনাদ হাসান।

[২৫৪] সাখাওয়ি, *আল-মাকাসিদ* : ৮৭৭ বলেন, "এটি বর্ণিত হয়েছে আবু সালিহ থেকে আল-কালবি, তাঁর থেকে আল-ফাররা কর্তৃক।

[২৫৫] সূরাহ আলাম নাশরহ, ৯৪ : ১

কষ্টের কাঁধ উষ্ণ করে নিজের শ্বাসে,
এর পেছন পেছনেই স্বস্তি চলে আসে।

একজন বলেছেন :

হতাশ হয়ে যায় অনেকে এমন সংকটে
যার সমাধান আসছে খুবই নিকটে।

আরেকজন বলেছেন :

হয়তো শীঘ্রই আসছে বিপদমুক্তি,
'হয়তো'ই আমাদের আত্মার যুক্তি।
হতাশার কাছে যখন করে আত্মসমর্পণ,
বিপদমুক্তি খুব নিকটেই থাকে তখন।

আরেকজন আবৃত্তি করেছেন :

সবকিছু যখন কঠিন লাগে, মুক্তি আশা করো তখনই,
মুক্তি খুব কাছেই থাকে, বিপদ ঘনীভূত হয় যখনই।

আরেকজন নিচের চরণগুলো রচনা করেছেন :

একদিনের জন্য কষ্টে পতিত হলে হতাশ হোয়ো না,
কতশত দিন যে স্বস্তিতে বাঁচবে, তা তুমি জানো না।
রবের ব্যাপারে কুধারণা রেখো না, সৌন্দর্য তাঁরই ভূষণ,
কখনো নিরাশ হোয়ো না, এ যে কুফরি এক ভীষণ!
অল্পতেই তোমার সেরে যাবে প্রয়োজন,
জেনে রেখো কষ্টকে স্বস্তি করে অনুসরণ।
যত বক্তা রাখে তাদের বক্তব্য,
আল্লাহর কথাই তার মাঝে সর্বাধিক সত্য।
তাঁদের একজন বলেছেন,
ধৈর্য হলো কষ্টমুক্তিদ্বার,
কষ্টকে স্বস্তি অনুসরণ করে প্রতিবার।
থেমে থাকে না কখনো সময়
এক ঘটনার পর আরেক ঘটনা হয়।

বিপদ-আপদ প্রদানের কিছু সূক্ষ্ম উপকারিতা ও প্রজ্ঞার কথা বর্ণনা করে আমরা এই আলোচনা শেষ করব।

১. গুনাহ মাফ হয় ও ধৈর্য ধরে বিপদ সহ্য করার সাওয়াব লাভ হয়। বিপদটির কারণে সাওয়াব পাওয়া যায় কি না—এ নিয়ে আলিমগণের মতভেদ আছে।

২. বান্দার তার গুনাহের কথা স্মরণ হয় এবং সে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে তাওবাহর সুযোগ পায়।

৩. শক্ত ও কঠিন থাকার পর অন্তর নরম হয়। একজন সালাফ বলেছিলেন, "কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে গুনাহের কথা স্মরণ করতে পারে। এবং আল্লাহর ভয়ে মাছির মাথা পরিমাণ অশ্রুও যদি নির্গত হয়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"

৪. ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সামনে বিনয়ী করে। প্রচুর নেক আমলের চেয়ে এ রকম একটি অবস্থাই আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

৫. এসব বিপদের কারণে ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহর দিকে ঘুরে যায়, সে তাঁর দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ায়, তাঁকে ডাকে ও তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এটি হলো বিপদের সবচেয়ে বড় লাভ। যারা বিপদের সময় আল্লাহর সামনে বিনীত হয় না, আল্লাহ তাদের তিরস্কার করেছেন :

> **"আমি তাদের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট নত হলো না, আর তারা কাকুতি-মিনতিও করল না।"**[২৫৬]

> **"তোমার পূর্বে আমি অনেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। আর অভাব-অনটন ও দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা বিনয়ী হয়।"**[২৫৭]

পূর্বের এক আসমানি কিতাবে আছে, "আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন, কারণ তিনি তার কাছে কাকুতি-মিনতি শুনতে ভালোবাসেন।"

সাইদ বিন আব্দুল আযীয বলেন, "দাউদ (আ.) বলেন, 'সুমহান সেই সত্তা, যিনি বিপদে ফেলে বান্দাকে দু'আ করতে বাধ্য করেন। সুমহান সেই সত্তা, যিনি স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের মাধ্যমে কৃতজ্ঞ হতে দেন।'"

মুহাম্মাদ আল-মুনকাদির (রহ.) প্রচণ্ড কষ্টে ছিলেন। আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবনু আলি (রহ.) তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর ব্যাপারে মানুষকে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা জানাল তিনি ঋণগ্রস্ত। আবু জাফার বললেন, "তাঁর জন্য কি দু'আর

---

[২৫৬] সূরাহ আল-মুমিনূন, ২৩ : ৭৬
[২৫৭] সূরাহ আল-আন'আম, ৬ : ৪২

দরজা খুলেছে?” তারা জানাল, “হ্যাঁ।” আবু জাফার বললেন, “বান্দা সত্যিই সৌভাগ্যবান, যদি সে প্রয়োজনের সময় তার রবকে বেশি বেশি ডাকে, তা যে প্রয়োজনই হোক না কেন।”

তাঁদের কেউ কেউ বিপদে পড়ে দু'আ করার সময় দ্রুত জবাব আশা করতেন না। তাঁদের যে রবকে প্রয়োজন হয়েছে, এই অবস্থাটি দ্রুত শেষ হয়ে যাক–তা তাঁরা চাইতেন না। সাবিত বলেন, “মুমিন যখন আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ্ জিবরীলকে তার প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব দিয়ে বলেন, 'তার প্রয়োজন পূরণ করতে তাড়াহুড়া করবে না। আমি আমার মুমিন বান্দার কণ্ঠ শুনতে ভালোবাসি।'” এটি নবীজি ﷺ-এর হাদীস হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সকল সনদ দুর্বল।[২৫৮]

একজন সালাফ স্বপ্নে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করে বললেন, “হে আল্লাহ, আমি আপনাকে অনেক ডেকেছি, কিন্তু জবাব পাইনি।” তিনি জবাব দিলেন, “আমি তোমার কণ্ঠ শুনতে ভালোবাসি।”

৬. বিপদ-আপদের ফলে অন্তর ধৈর্যের ও সন্তুষ্টির মিষ্টতা অনুভব করে। এটি হলো বিরাট পুরস্কারের পদ, যার মর্যাদা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

৭. বিপদের ফলে বান্দা সৃষ্টির থেকে মুখ ফিরিয়ে স্রষ্টামুখী হয়। আল্লাহ বলেছেন মুশরিকরাই বিপদের সময় এক আল্লাহকে ডাকে, তাহলে মুমিনের অবস্থা কী?

৮. বিপদের ফলে বান্দা তাওহীদকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে ও একে অন্তরে অনুভব করে।[২৫৯]

এক ইসরাঈলী বর্ণনায় আছে, (আল্লাহ বলেন),

> “বিপদ তোমাকে আর আমাকে কাছে আনে। স্বাচ্ছন্দ্য তোমাকে তোমার কাছে আনে।”

---

[২৫৮] তাবারানি, *আল-আসওয়াত*: ৮৪৪২; জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। হায়সামি : খণ্ড ১০, ১৫১ পৃষ্ঠাতে বলেন, “এর ইসনাদে ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবু ফারওয়া আছেন, যিনি মাতরুক।”

[২৫৯] বিপদের ফযিলতের আরও পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য পরিশিষ্ট তিন দ্রষ্টব্য।

উপসংহার

সাধারণভাবে বললে, যখন বিপদ ঘনীভূত হয় আর দুর্দশা বাড়ে, বিপদমুক্তি তখন নিকটে চলে আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

> **"শেষ পর্যন্ত রাসূলগণ নিরাশ হয়েছে এবং তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তখনই তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছে। এভাবেই যাকে ইচ্ছা, আমি রক্ষা করি।..."[২৬০]**

> **"...তাদেরকে অভাবের তীব্র তাড়না ও বিপদ স্পর্শ করেছিল। আর তারা এতদূর প্রকম্পিত হয়েছিল যে, নবী ও তার সঙ্গের মুমিনগণ চিৎকার করে বলেছিল, 'কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য?' জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"[২৬১]**

ইয়াকুব ﷺ কখনোই ইউসুফ ﷺ-কে খুঁজে পাবার ব্যাপারে নিরাশ হননি। তিনি তাঁর অন্য ছেলেদের বলেছিলেন :

> **"...যাও, গিয়ে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না..."[২৬২]**

তিনি আরও বলেছিলেন :

> **"...হয়তো আল্লাহ তাদের একত্রে আমার কাছে এনে দেবেন..."[২৬৩]**

বিপদ চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার সাথে বিপদমুক্তিকে সংযুক্ত করার পেছনে একটি প্রজ্ঞা এই যে, এমন অবস্থায় বান্দা মাখলুকের পক্ষ থেকে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এর বদলে বান্দা আল্লাহর দিকে মুখ করে এবং শুধু তাঁরই উপর নির্ভর করে। বান্দা যখন মাখলুক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক আল্লাহ-অভিমুখী হয়, তিনি তখন দু'আর জবাব দেন ও তাকে বিপদমুক্ত করেন। তাওয়াক্কুল[২৬৪] হলো বান্দার উপর সকল আশা ছেড়ে দিয়ে তাদের থেকে চোখ

---

[২৬০] সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ১১০

[২৬১] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ২১৪

[২৬২] সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ৮৭

[২৬৩] সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ৮৩

[২৬৪] বায়হাকি, *শুয়াব* : খণ্ড ২, ৯৯-১০০ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেন, আলি ইবনু আহমাদকে তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "এই যে, তুমি নিজের ও তোমার মতো

ফিরিয়ে নেওয়া। ইমাম আহমাদ ﷺ এ কথা উল্লেখ করে প্রমাণ হিসেবে ইবরাহীম ﷺ উক্তি উল্লেখ করেছেন। তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। তখন জিবরীল ﷺ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনার কি কিছু লাগবে?" তিনি বলেছেন, "আপনার কাছে থেকে লাগবে না।"[২৬৫]

তাওয়াক্কুল হলো প্রয়োজন পূরণ করার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান, যে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করে।

"যে কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট।"[২৬৬]

ফুদাইল ﷺ বলেন, "আল্লাহর কসম! তুমি যদি সৃষ্টির উপর থেকে সকল আশা এমনভাবে ছেড়ে দিতে যে তাদের কাছে তুমি আর কিছু চাওই না, তোমার মনিব তোমাকে তুমি যা চাও তা-ই দিতেন।"

আরেকটি প্রজ্ঞা হলো, যখন বিপদ ঘনীভূত হয়, বান্দাকে তখন শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। না হলে শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দেবে নিরাশ হওয়ার জন্য। বান্দাকে অবশ্যই এই ওয়াসওয়াসা দমন করতে হবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তাকে দমন করার পুরস্কারস্বরূপ আসবে বিপদ থেকে মুক্তি। এক সহীহ হাদীসে এসেছে,

> "তুমি অধৈর্য হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার দু'আর জবাব দিতে থাকা হবে। যতক্ষণ না সে (অধৈর্য হয়ে) বলে, 'আমি দু'আ করেছি, কিন্তু কোনো জবাব পাইনি।' অতএব সে দু'আ করা ছেড়ে দেয়।"[২৬৭]

অন্য কারও শক্তি-সক্ষমতার উপর নির্ভর করা ত্যাগ করবে।" মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইম বলেন, "তাওয়াক্কুল হলো হৃদয়ের এই ভাবনা যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না; আর যা-ই ঘটুক, সবই অসন্তোষ ছাড়া মেনে নিতে পারা।"

[২৬৫] বায়হাকি, *শুয়াব* : ১২৯৩, আবু ইয়াকুব থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "তাওয়াক্কুলের আসল হাকিকত বুঝতে পেরেছিলেন আর-রহমানের খলীল ইবরাহীম ﷺ যখন তিনি জিবরীল ﷺ-কে বলেছেন, 'আপনার থেকে না।' কারণ, তাঁর আত্মা পুরোই আল্লাহর প্রতি মগ্ন ছিল। তিনি তাঁকে ছাড়া কিছুই দেখছিলেন না। তিনি আল্লাহর সামনে আল্লাহর ওয়াস্তে চরম সশ্রদ্ধ ভয় প্রদর্শন করেছেন। এটি তাওহীদের একটি আলামত এবং নবী ﷺ-এর উপর আল্লাহর ক্ষমতা বাস্তবায়নের প্রমাণ।"

[২৬৬] সূরাহ আত-তলাক, ৬৫ : ৩

[২৬৭] *বুখারি*: ৬৩৪০; *মুসলিম*: ২৭৩৫; আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত।

আরেকটি হিকমাহ হলো, বিপদমুক্তি যদি ধীরে ধীরে আসে, বান্দা যদি তা পাওয়ার আশা একেবারে ছেড়ে দেয়–বিশেষত প্রচুর দু'আ করার পর সে নিজের অন্তরের দিকে তাকাবে আর এই বলে নিজেকে তিরস্কার করবে, "আমি কেবল তোমার কারণেই এই বিপদে পড়েছি। তোমার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকত, তাহলে দু'আর জবাব চলেই আসত।"

প্রচুর নেক আমলের চেয়ে বান্দার এই আত্মোপলব্ধিই আল্লাহর বেশি প্রিয়। কারণ, তখন বান্দা আল্লাহর জন্য নিজের নফসকে চূর্ণ করে। বান্দা উপলব্ধি করে যে, সে মনিবের জবাব পাওয়ার যোগ্য না। আর এমন অবস্থাতেই আল্লাহর সাহায্য ও বিপদমুক্তি একদম নিকটে থাকে। আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা আল্লাহর জন্য নিজের নফসকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। তাদের ভাঙার অনুপাতে আল্লাহ তা মেরামত করে দেন।[২৬৮]

---

[২৬৮] *আয-যুল্ল ওয়াল-ইনকিসার* গ্রন্থের লেখক বলেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেসব হৃদয় জোড়াদানকারী, যা তাঁর ওয়াস্তে ভেঙেছে। গোপনে সালাতে দাঁড়ানো ব্যক্তির কাছে তিনি যেভাবে আসেন, তাঁর প্রতি বিনয়ে পরিপূর্ণ অন্তরের কাছে তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেভাবে আসেন। বান্দার ভগ্নদশাকে এই নৈকট্যের চেয়ে বেশি আর কিছুই পরিচর্যা করতে পারে না।"

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ *কিতাবুয যুহদ*-এ ইমরান ইবনুল কুসাইর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "মূসা ইবনু ইমরান আলাইহিস সালাম বললেন, 'হে রব্ব, আপনাকে কোথায় খুঁজব?' তিনি বললেন, 'তাদের কাছে আমাকে খোঁজো, যাদের হৃদয় আমার জন্য ভেঙেছে। প্রতিদিন আমি এক হাত করে তাদের নিকটে আসি। না হলে তারা ধ্বংসই হয়ে যেত।'"

ইবরাহীম ইবনুল জুনাইদ *আল-মাহাব্বাহ* গ্রন্থে জাফার ইবনু সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি মালিক ইবনু দিনারকে বলতে শুনেছি, 'মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে আল্লাহ, আপনাকে কোথায় খুঁজব? আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ওয়াহীর মাধ্যমে জানালেন, মূসা, তাদের কাছে আমাকে খোঁজো, যাদের হৃদয় আমার জন্য ভেঙেছে। প্রতিদিন আমি এক হাত করে তাদের নিকটে আসি। না হলে তারা ধ্বংসই হয়ে যেত।' আমি মালিক ইবনু দিনারকে বললাম, 'ভাঙা হৃদয় মানে?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমি কিতাবের এক জ্ঞানীকে এই প্রশ্ন করে জানলাম তিনি এই একই প্রশ্ন আব্দুল্লাহ ইবনু সাল্লামকে করায় তিনি জবাব দেন, ভাঙা হৃদয় হলো যেসব হৃদয় অন্য কোনো কিছুর ভালোবাসার বদলে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার ভালোবাসায় ভেঙেছে।'"

সহীহ সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ সেই অন্তরের নিকটবর্তী যা তাঁর দেওয়া পরীক্ষায় ভগ্ন, তাঁর নির্ধারিত তাকদীরের ব্যাপারে ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট। *সহীহ মুসলিমে* আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, "আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কিয়ামাতের দিন বলবেন, 'হে আদমসন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসোনি।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, কী করে আমি আপনাকে দেখতে যেতে পারি যখন আপনি রব্বুল আলামীন?' তিনি জবাব দেবেন, 'তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তারপরও তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তুমি কি জানতে না যে, তুমি তাকে দেখতে গেলে আমাকে তার সাথে পেতে?'"

ওয়াহব ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি কিছু সময় ধরে আল্লাহর ইবাদাত করে। তারপর তার এক প্রয়োজন দেখা দেয়, যা পূরণ করতে হবে। সে সত্তরটি শনিবার যাবৎ সিয়াম পালন করল এবং প্রতি শনিবারে এগারোটি খেজুর খেলো। তারপর সে আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজনের কথা বলল, কিন্তু তা পূরণ করা হলো না। সে নিজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকত, তাহলে তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়া হতো।' এমন সময় এক ফেরেশতা অবতরণ করে বললেন, 'হে আদমসন্তান, এখন তুমি যে অবস্থায় আছো, তা তোমার আগের এত বছরের সকল নফল ইবাদাতের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ এখন তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দিলেন।"

যে কেউ তা উপলব্ধি ও বাস্তবায়ন করে, সে বুঝতে পারবে যে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতের চেয়ে বিপদের সময়ে দেওয়া তাঁর নিয়ামাত অনেক উত্তম। এই বিষয়টিই এক সহীহ হাদীসে উঠে এসেছে। নবীজি ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার জন্য যে ফায়সালাই করেন, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি সে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, সে এর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ও তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। সে যদি দুর্দশায় পতিত হয়, তাহলে সে এর জন্য ধৈর্যধারণ করে ও তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। এটি শুধু মুমিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।"[২৬৯]

এই অবস্থায় পৌঁছে যান যুহদ-চর্চাকারীরা। তাঁরা যে অবস্থায় আছেন, কোনো পরিবর্তন কামনা না করে তাঁরা সে অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হয়ে যান। সেই অবস্থায় যেসব ইবাদাত করা দরকার, সেগুলো করতে থাকেন।

মুসনাদু আহমাদ ও *তিরমিযিতে* আবু উমামাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমার রব মক্কার সমতল ও পাথরগুলোকে স্বর্ণে পরিণত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, 'না, হে রব; বরং আমি একদিন পেট ভরে খাব আর আরেকদিন ক্ষুধার্ত থাকব। যখন আমি ক্ষুধার্ত থাকব, তখন আপনার দিকে রুজু হয়ে বিনীতভাবে দু'আ করব এবং আপনাকে স্মরণ করব। যখন আমার

আবু নুয়াইম দামরাহর সূত্রে ইবনু শাওযাব থেকে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ তা'আলা মূসার ﷺ প্রতি ওয়াহী করেন, 'তুমি কি জানো কেন আমি সকলের মধ্যে কেবল তোমাকেই আমার রাসূল ও কালিম বানালাম?' মূসা ﷺ বললেন, 'না, হে প্রতিপালক।' তিনি জবাব দিলেন, 'কারণ তোমার মতো আর কেউই আমার সামনে এত বিনয়ী ও নম্র নয়।'"

[২৬৯] *মুসলিম*: ২৯৯৯; সুহাইব ইবনু সিনান ﷺ থেকে বর্ণিত।

পেট ভরা থাকবে, তখন আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করব এবং আপনার প্রশংসা করব।'"[২৭০]

উমার ﷺ বলেন, "আমি ঘুম থেকে জেগে নিজেকে আমার পছন্দনীয় অবস্থায় পাই নাকি অপছন্দনীয় অবস্থায় পাই, তা নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। কারণ, আমি জানি না কোন অবস্থায় আমার জন্য কল্যাণ আছে।"[২৭১]

উমার বিন আব্দুল আযীয ﷺ বলেন, "এক সকালে ঘুম থেকে জেগে আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমার আনন্দ ও মুক্তি নির্ভর করে তাকদীরের নির্ধারিত বিষয় সংঘটনের মধ্যেই।"

হে মানুষ, কেন তুমি পালিয়ে যাও, যখন আল্লাহ তোমায় ডাকেন? তিনি তাঁর নিয়ামাত বর্ষণ করতে থাকেন, তারপরও তুমি তাঁকে ভুলে যাও আর অবহেলা করো। তিনি তোমাকে বিপদে আপতিত করেন, যাতে তুমি তাঁর দিকে ফিরে যাও। যাতে তুমি তাঁর দুয়ারে গিয়ে বিনীতভাবে কাকুতি-মিনতি করো। বিপদ তোমাকে আর তাঁকে কাছে এনে দেয়, স্বাচ্ছন্দ্য তোমাকে তোমার নিজের কাছে এনে দেয়।

আমরা যদি পরস্পরকে করি দোষারোপ
দূরদূরান্তের ভূমিতে পেয়ে যাই লোপ,
যে ভালোবাসা তুমি জানো, তা রয়েই যাবে,
তোমার নিয়ামাত কখনো না ক্ষয়েই যাবে।
বিপদের মাঝে লুক্কায়িত অনেক উপহার,
অবকাশের মাঝে আছে অনেক গুপ্তভান্ডার।

হে মানুষ, আল্লাহর নিয়ামাতের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারাটাও আল্লাহর দেওয়া আরেকটি নিয়ামাত। অতএব, এর জন্যও কৃতজ্ঞ হও। তুমি যদি বিপদের মুখে ধৈর্যশীল থাকো, সেই ধৈর্যও আল্লাহর দেওয়া এক নিয়ামাত। তার কৃতজ্ঞতা আদায় করো। তোমার প্রতিটি অবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামাত, অতএব অকৃতজ্ঞ হোয়ো না।

"...তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলে কখনো তার সংখ্যা

---

[২৭০] আহমাদ : ২২১৯০ এবং তিরমিযি : ২৩৪৭, তিনি একে হাসান বলেছেন; আলবানি, *তাহকিক বিদায়াতুস সুল* : ৬৩ পৃষ্ঠাতে হাদীসের প্রথম অংশকে শাহীদের কারণে সহীহ বলেছেন। আর দ্বিতীয় অংশ "যখন আমার পেট ভরা থাকবে..." একে মুনকার বলেছেন। আরনাউতের মতে এর ইসনাদ যঈফ জিদ্দান।

[২৭১] ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ* : পৃষ্ঠা ২১

নির্ধারণ করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই বড়ই সীমালঙ্ঘনকারী, বড়ই অকৃতজ্ঞ।"[২৭২]

রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা রবেরই দয়ার ফল,
তাই এরও কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা সকল।
কৃতজ্ঞতা কী করে তাঁর নিয়ামাত না হতে পারে?
দিন-মাস-বছর যায় বারেবারে বারেবারে।
মানুষ যদি সুখ দেখে, খুশি হয়ে যায় তারা,
বিপদ যদি আসে, বিপদমুক্তি করছে ত্বরা।
উভয় অবস্থায় তিনি নাযিল করেন এমনই বৈভব,
সাগর আর মাটি দিয়ে তা পরিমাপ হয় না সম্ভব।

আল্লাহর দয়া, রিযক ও তাকদীরের লিখনে এই রচনা শেষ হলো। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।

[২৭২] সূরাহ ইবরাহীম, ১৪ : ৩৪

পরিশিষ্ট এক
হাদীসসমূহের উৎস

ইবনে আব্বাস ﷺ-এর হাদীসটির বেশ কয়েকটি বর্ণনাসূত্র রয়েছে:

১. হানাশ আস-সান'আনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, 'হে বালক, আমি তোমার কাছে কিছু কথা বর্ণনা করব। আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাঁকে তোমার আগে পাবে। যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। পুরো জাতি যদি এক হয়ে তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেননি, তাহলে তারা তা করতে পারবে না। তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেননি, তাহলে তারা তা করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে।"

আহমাদ: ২৬৬৯-২৭৬৩; ইবনু ওয়াহব, *আল-কাদর*: ২৮; *তিরমিযি*: ২৫১৬ এবং শব্দ তাঁর। তিনি বলেছেন এটি হাসান।

একই রকম শব্দে হাদীসটি রয়েছে *তিরমিযি*, আদ-দু'আ : ৪২, আব্দুল্লাহ আস-সালিহের সূত্রে।

আহমাদ : ২৮০৩; বায়হাকি, *শুয়াবুল ঈমান* : ১০৭৪, হানাশের সূত্রে এই শব্দমালায়, ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, "আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসে থাকা অবস্থায় তিনি বললেন, 'হে বালক, তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিই, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার উপকার সাধন করবেন?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি ﷺ বললেন, 'আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে জেনো, তাহলে তোমার বিপদের সময় তিনি তোমাকে জানবেন। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহরই কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। যা যা ঘটবে, (তা লেখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একত্র হয়ে যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায় যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায় যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে

সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ, বিজয় রয়েছে ধৈর্যের মধ্যে, কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি, আর কাঠিন্যের সাথে আছে সহজতা।'"

২. ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ, গুফরাহর আযাদকৃত দাস উমারের থেকে, তিনি ইকরিমাহ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, "আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'বালক, তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিই যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার উপকার করবেন?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে জানো, তাহলে তোমার দুর্দশার সময়ে তিনি তোমাকে জানবেন। যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। যা কিছু ঘটবে (তা লেখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একত্র হয়ে যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায় যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায় যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ, বিজয় রয়েছে ধৈর্যের মধ্যে, কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি, আর কাঠিন্যের সাথে আছে সহজতা।'"

বর্ণনা করেছেন তাবারানি, *আল-কাবির* : খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২২৩।

৩. ইবনু আবি মুলাইকাহর সূত্রে যিনি ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বালক, আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে জেনো, তাহলে তোমার দুর্দশার সময় তিনি তোমাকে জানবেন। জেনে রেখো, যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল। আর যা তোমার উপর আপতিত হয়নি, তা কখনোই হওয়ার ছিল না। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ মিলে যদি তোমাকে এমনকিছু দেওয়ার চেষ্টা করত যা আল্লাহ তোমার জন্য চাননি, তাহলে তারা তা করতে পারত না। আর তারা যদি তোমার থেকে এমন কিছু সরিয়ে দিতে চাইত যা তোমার উপর আপতিত হোক বলে আল্লাহ চেয়েছেন, তাহলে তারা তা করতে পারত না। যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। জেনে রেখো, বিজয় আসে ধৈর্যের সাথে, মুক্তি আসে বিপদের সাথে, আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা। জেনে রেখো, যা কিছু ঘটবে, তা কলম লিখে রেখেছে।"

বর্ণনা করেছেন উকাইলি : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯৭-৩৯৮; তাবারানি, *আল-কাবির*, : খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ১২৩; আদ-দু'আ : ৪১; বায়হাকি, *আল-আদাব* : ১০৭৩।

৪. আতা ইবনু আবু রাবাহর সূত্রে যিনি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ইবনে আব্বাস, আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে জেনো, তাহলে তোমার দুর্দশার সময় তিনি তোমাকে জানবেন। জেনে রেখো, যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল। আর যা তোমার উপর আপতিত হয়নি, তা কখনোই হওয়ার ছিল না। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ মিলে যদি তোমাকে এমনকিছু দেওয়ার চেষ্টা করত যা আল্লাহ তোমার জন্য চাননি, তাহলে তারা তা করতে পারত না। আর তারা যদি তোমার থেকে এমন কিছু সরিয়ে দিতে চাইত যা তোমার উপর আপতিত হোক বলে আল্লাহ চেয়েছেন, তাহলে তারা তা করতে পারত না। কিয়ামাত পর্যন্ত যা ঘটবে (তা লেখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে। যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। নিশ্চিত থেকো, বিজয় আসে ধৈর্যের সাথে, মুক্তি আসে বিপদের সাথে, আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা।"

আব্দ ইবনু হুমাইদ এটি বর্ণনা করেন, ৬৩৪ (*আল-মুন্তাখাব*)

আতা ইবনু আবু রাবাহ থেকে ইবনু আব্বাস رضي الله عنه পর্যন্ত আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "আমি যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ পেছনে বসা ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন, 'বালক, আমার থেকে এই কথাগুলো শিখে নাও। আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যদি সমগ্র সৃষ্টিজগৎ মিলে তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত রাখেননি, তারা তা করতে পারবে না।'"

ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ্*; উকাইলি : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৩; তাবারানি, *আল-কাবির* : খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ১৭৮

৫. উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, 'হে বালক, তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিই, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার উপকার সাধন করবেন?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি ﷺ বললেন, 'আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে

পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে জেনো, তাহলে তোমার বিপদের সময় তিনি তোমাকে জানবেন। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহরই কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। যা কিছু ঘটবে (তা লেখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ মিলে যদি তোমাকে এমন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে যা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তোমার জন্য নির্ধারিত রাখেননি, তাহলে তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর তারা যদি তোমার থেকে এমন কিছু প্রতিরোধ করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত রেখেছেন, তাহলে তারা তা করতে সমর্থ হবে না। জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ। বিজয় আসে ধৈর্যের সাথে, মুক্তি আসে বিপদের সাথে, আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা।'"

আবু নুয়াইম : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৪

৬. আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর সূত্রে ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, "বালক।" তিনি জবাব দিলেন, "হাজির আছি, হে আল্লাহর রাসূল।" তিনি বললেন, "আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে জেনো, তাহলে তোমার বিপদের সময় তিনি তোমাকে জানবেন। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহরই কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। যা কিছু ঘটবে (তা লেখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে। সমগ্র জাতি মিলে যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত রাখেননি, তাহলে তারা তা করতে পারবে না। আর তারা যদি তোমার এমন ক্ষতি করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত রাখেননি, তারা তা করতে পারবে না। তুমি যদি ইয়াকীনপূর্ণ অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর জন্য আমল করতে পারো, তবে তা করো। আর যদি তা না পারো, তাহলে জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ। বিজয় আসে ধৈর্যের সাথে, মুক্তি আসে বিপদের সাথে, আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা।"

হাকিম : ৬৩০৩

৭. ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে হাজ্জাজ ইবনুল ফুরাদাহর সূত্রে।

৮. ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে হুমাম ইবনু ইয়াহইয়া আল-বাসরির সূত্রে।

এগুলো ১ নং এর মতো একই শব্দবিশিষ্ট এবং আহমাদ বর্ণনা করেছেন, ২৮০৩

আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১২-তে তিন্নাওখি থেকে বর্ণিত আলি ﷺ-এর হাদীসটির ইসনাদ অতি দুর্বল। এতে আলি ইবনু আবু আলি নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, যিনি মাতরুক। (*আল-মিযান* : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৭)

আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ গ্রন্থে ইবনু আবিদ্দুনিয়া কর্তৃক এবং *আল-ফারাজ বাদাশশিদ্দাহ* গ্রন্থের খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা ১১২-তে তিন্নাওখি কর্তৃক বর্ণিত সাহল ইবনে সাদের হাদীসটির সনদ দুর্বল। *আদ-দুররুল মানসুর* : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৯-এ সুয়ুতি একে দারুকুতনি, আফরাদ, ইবনু মারদাওয়াইহ, বায়হাকি এবং আসবাহানির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

আবু সাইদ আল-খুদরির হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে *আবু ইয়ালা* : ১০৯৯; ইবনু আবিদ্দুনিয়া : খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৬৮৩-তে অতি দুর্বল ইসনাদে। কারণ, এতে ইয়াহইয়া ইবনে মায়মুন ইবনে আতা নামে একজন মাতরুক এবং আলি ইবনু যাইদ ইবনু জুদান নামে একজন যঈফ বর্ণনাকারী আছেন।

এ ছাড়াও হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু জাফার থেকে ইবনু আবি আসিম কর্তৃক দুর্বল ইসনাদে বর্ণিত হয়েছে, ৩১৫

পরিশিষ্ট দুই

ধৈর্যের ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ-এর বক্তব্য

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ধৈর্যকে বানিয়েছেন প্রতিযোগিতার এমন এক ঘোড়া, যা কখনো হোঁচট খায় না বা টলমল করে না; এমন এক তরবারি, যার ধার কখনো কমে না; এমন এক বিজয়ী সেনাদল, যাদের কখনো পরাজিত করা যায় না; এমন এক শক্তিশালী দুর্গ, যা কখনো ভাঙে না–বিজিত হয় না। ধৈর্য আর আসমানি সাহায্য হলো রক্তের দুই ভাই।

আসমানি সাহায্য আসে ধৈর্যের মাধ্যমে, বিপদের পেছন পেছন আসে মুক্তি, আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা। একদল সৈন্যের চেয়েও বেশি সাহায্য-সহযোগিতা করে ধৈর্য। বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে এটি হলো দেহের মাথার মতো। সত্যবাদী নিশ্চয়তাদাতা আল্লাহ তাঁর কিতাবে ওয়াদা করেছেন যে তিনি ধৈর্যশীলকে অপরিমিত পুরস্কার দেবেন। তিনি জানিয়েছেন যে পথপ্রদর্শন করা, সাহায্য করা ও সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করার মাধ্যমে তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

"এবং ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[২৭৩]

আল্লাহকে সাথে পাওয়ার মাধ্যমে ধৈর্যশীলরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিয়ামাত লাভ করে।

দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বকে আল্লাহ ধৈর্য ও ইয়াকীনের উপর নির্ভরশীল করেছেন :

"আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক সৎপথ প্রদর্শন করত, যতদিন তারা ধৈর্য অবলম্বন করে ছিল আর আমার আয়াতসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।"[২৭৪]

"আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য তা অবশ্যই উত্তম।"[২৭৫]

তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে ধৈর্যধারণকারী ও মুত্তাকীর বিরুদ্ধে শত্রুর কোনো চক্রান্ত সফল হয় না :

---

[২৭৩] সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৪৬
[২৭৪] সূরাহ আস-সাজদাহ, ৩২ : ২৪
[২৭৫] সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ১২৬

"কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।"[২৭৬]

তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে সত্যবাদী নবী ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য ও তাকওয়াই তাঁকে সম্মান ও কর্তৃত্বের আসনের দিকে ধাবিত করেছে :

"যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্যধারণ করে, এমন সৎকর্মশীলদের কর্মফল আল্লাহ্ কখনো বিনষ্ট করেন না।"[২৭৭]

সাফল্য নির্ভর করে ধৈর্য ও তাকওয়ার উপর :

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যধারণে (শত্রুদের চেয়ে) অগ্রগামী হও, যদ্ধুক্ষেত্রে দৃঢ় থাকো। আর তাকওয়া অবলম্বন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[২৭৮]

আল্লাহ্ তা'আলাকে যারা চায়, তাদের শ্রেষ্ঠতম উপায়ে উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন :

"আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[২৭৯]

তিনি ধৈর্যশীলদের তিনটি বিষয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন, যে সুসংবাদপ্রাপ্তদের সবচেয়ে বেশি ঈর্ষা করা উচিত :

"ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করো, নিশ্চয়ই যারা বিপদকালে বলে 'আমরা আল্লাহ্‌র, তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী। এদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও করুণা আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[২৮০]

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।"[২৮১]

তিনি ঘোষণা করেছেন যে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের মহাবিজয় লাভ করে কেবল ধৈর্যশীলরা :

---

[২৭৬] সূরাহ্ আলে ইমরান, ৩ : ১২০
[২৭৭] সূরাহ্ ইউসুফ, ১২ : ৯০
[২৭৮] সূরাহ্ আলে ইমরান, ৩ : ২০০
[২৭৯] সূরাহ্ আলে ইমরান, ৩ : ১৪৬
[২৮০] সূরাহ্ আল-বাকারাহ, ২ : ১৫৫-১৫৭
[২৮১] সূরাহ্ আল-বাকারাহ, ২ : ৪৫

"আজ আমি তাদের পুরস্কৃত করলাম তাদের ধৈর্যধারণের কারণে, আর তারাই তো সফলকাম।"[২৮২]

তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর পুরস্কারের আশা করতে এবং দুনিয়া ও এর ছলনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সক্ষম একমাত্র ধৈর্যশীল মুমিনরা :

"কিন্তু যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদের! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম। কিন্তু কেবল ধৈর্যশীলরাই তা লাভ করবে।'"[২৮৩]

মন্দকে উত্তম দিয়ে প্রতিহত করলে শত্রুরাও বন্ধুতে পরিণত হয় :

"...আর মন্দকে প্রতিহত করো উত্তম দিয়ে, তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে পরিণত হবে তোমার প্রাণের বন্ধুতে।"[২৮৪]

ধৈর্যশীল ছাড়া আর কেউই এই গুণ লাভ করতে পারে না। সৌভাগ্যবান ছাড়া আর কেউই এই গুণ লাভ করতে পারে না।[২৮৫]

আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলছেন :

"নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। তবে তারা নয় যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"[২৮৬]

তিনি তাঁর সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন–ডান দিকের দল ও বাম দিকের দল। তিনি ডান দিকের দলের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন পরস্পরকে ধৈর্য ও দয়ার উপদেশ দেওয়ার কথা।[২৮৭] ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন আল্লাহর আয়াত থেকে উপকৃত হওয়ার কথা। তিনি তাঁর কিতাবের চারটি আয়াতে বলেছেন :

"নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির

---

২৮২ সূরাহ আল-মুমিনূন, ২৩ : ১১১
২৮৩ সূরাহ আল-কাসাস, ২৮ : ৮০
২৮৪ সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪
২৮৫ সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৫ দ্রষ্টব্য
২৮৬ সূরাহ আল-আসর, ১০৩ : ২-৩
২৮৭ সূরাহ আল-বালাদ, ৯০ : ১৭

জন্য।"[২৮৮]

তিনি ক্ষমা ও পুরস্কারের শর্ত বানিয়েছেন সৎকর্ম ও ধৈর্যধারণ করাকে। তিনি যাকে পথ দেখান, তার জন্য তা নিঃসন্দেহে সহজ :

> **"শুধু তারা ব্যতীত যারা ধৈর্যধারণ করে ও সৎকর্ম করে। তারা লাভ করবে ক্ষমা ও অপরিমিত পুরস্কার।"[২৮৯]**

ধৈর্য ও ক্ষমা হলো এমনই সুনিশ্চিত বিষয় যে, যারা এর সওদা করবে তারা কখনোই ক্ষতির সম্মুখীন হবে না।

> **"কিন্তু কেউ যদি ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে, তাহলে তা অবশ্যই দৃঢ়চিত্ততার কাজ।"[২৯০]**

তিনি তাঁর রাসূল ﷺ-কে আদেশ করেছেন আল্লাহর ফায়সালার জন্য ধৈর্যধারণ করতে। আমাদের জানিয়েছেন যে, ধৈর্য হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্য। এর মাধ্যমে বিপদ-আপদ সহ্য করা সহজ হয়ে যায় :

> **"তুমি ধৈর্য ধরে তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকো। তুমি আমার দৃষ্টির সামনেই আছো।"[২৯১]**
> **"তুমি ধৈর্যধারণ করো। তোমার ধৈর্য তো কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত নয়। ওদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত হোয়ো না। আর ওদের ষড়যন্ত্রের কারণে অন্তরে কুণ্ঠাবোধ কোরো না। যারা তাকওয়াবান ও সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তো তাদেরই সঙ্গে আছেন।"[২৯২]**

ধৈর্য হলো মুমিনের রশি, যা তাকে বেঁধে রাখে। সে হয়তো কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করতে পারে, কিন্তু একটা সময় পর তাকে ফেরত আসাই লাগবে। এটি হলো ঈমানের খুঁটি, যার উপর সে নির্ভর করে। যার ধৈর্য নেই, তার ঈমান নেই। যদি থাকেও, তা অত্যন্ত দুর্বল। যার ধৈর্য নেই, সে যেন একদম নড়বড়ে কিনারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদাত করছে। যদি তার কল্যাণ হয়, সে শান্ত থাকে। কিন্তু যদি বিপদে পড়ে, তাহলে তার দুনিয়া উল্টে যায়। সে দুনিয়া-আখিরাত দুটিই হারায়।

---

২৮৮ সূরাহ লুকমান, ৩১ : ৩১; সূরাহ ইবরাহীম, ১৪ : ৫; সূরাহ সাবা, ৩৪ : ১৯; সূরাহ আশ-শূরা, ৪২ : ৩৩

২৮৯ সূরাহ হূদ, ১১ : ১১

২৯০ সূরাহ আশ-শূরা, ৪২ : ৩৩

২৯১ সূরাহ আত-তূর, ৫২ : ৪৮

২৯২ সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ১২৮-১২৮

সালাফগণ যে সর্বোত্তম জীবিকা লাভ করেছিলেন, তা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের ধৈর্যের কারণে। কৃতজ্ঞতার কারণে তাঁরা উন্নীত হয়েছিলেন সর্বোচ্চ স্তরে।[৯৩] কৃতজ্ঞতা আর ধৈর্যের ডানায় ভর দিয়ে তাঁরা উড়েছিলেন মহাসাফল্যের জান্নাতে। এই নিয়ামাত আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই কেবল দান করেন। তিনি মহাদানশীল।

ঈমান দুই ভাগে বিভক্ত—ধৈর্য আর কৃতজ্ঞতা। যে কেউ নিজের প্রতি সৎ, যে সফল হতে ইচ্ছুক, সে যেন এই দুটি মূলনীতিকে কখনোই অবহেলা না করে। কখনোই এ দুটি রাস্তা থেকে সরে না যায়। তাহলেই কেবল আল্লাহ বিচার দিবসে তাকে শ্রেষ্ঠতর দলে (জান্নাতিদের দল) স্থান দেবেন।

এরপর ধৈর্যের সংজ্ঞায় ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ লেখেন :

এটি এক মহান গুণ, যা আত্মাকে মন্দ ও অসন্তোষজনক কাজ করা থেকে বিরত রাখে। এই চমৎকার গুণের কারণেই আত্মার সংশোধন সম্ভব হয়।

জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ ﵀-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন, "এর অর্থ হলো ভ্রু না কুঁচকেই তিক্ততা হজম করে ফেলা।" যুন্নুন ﵀ বলেন, "ধৈর্য হলো (আল্লাহর হুকুম) অমান্য করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা, বিপদের কঠিন অংশগুলো সহ্য করার সময় নীরব ও স্থির থাকা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দারিদ্র্য আসার পরও অমুখাপেক্ষী থাকা।" আরও বলা হয়, "ধৈর্য হলো উত্তম

---

[৯৩] **শোকর** : কোনো উপকারের কারণে কারও প্রশংসা করা। ইবনুল কাইয়্যিম, *মাদারিজ* : খণ্ড ২, ২৪৪ পৃষ্ঠায় বলেন, "শোকর হলো আল্লাহর অনুগ্রহের প্রভাব প্রশংসা ও স্বীকৃতির মাধ্যমে মুখে প্রকাশ করা, সাক্ষ্য দেওয়া ও ভালোবাসার মাধ্যমে অন্তরে প্রকাশ করা, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ করা।" ফাইরোজাবাদি, বাসাইর, বলেন, "শোকর নির্মিত হয়েছে পাঁচটি খুঁটির উপর। অনুগ্রহ যিনি প্রদান করেছেন, তাঁর প্রতি আনুগত্য; তাঁকে ভালোবাসা; তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান; এর জন্য তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর অসন্তোষ উদ্রেককারী কোনো পথে তা ব্যবহার না করা।"

ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারি* : খণ্ড ১১, ৩১১ পৃষ্ঠাতে বলেন, "শোকরের অন্তর্ভুক্ত হলো আনুগত্য করে যাওয়ার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ এবং অবাধ্যতা থেকে দূরত্ব অবলম্বনে ধৈর্যধারণ। ইমামদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সবর থাকলে শোকর থাকতেই হবে। একটিকে ছাড়া আরেকটি পরিপূর্ণ হয় না। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়। কাজেই যে অনুগ্রহ লাভের অবস্থায় আছে, শোকর ও সবর প্রদর্শন করা তার উপর বাধ্যতামূলক। অবাধ্যতা থেকে সবর। যে বিপদগ্রস্ত, শোকর ও সবর প্রদর্শন করা তার উপর বাধ্যতামূলক। আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে শোকর। নিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্দশা উভয় অবস্থায় দাসত্ব করতে হবে কেবল আল্লাহর।"

আচরণের সহিত বিপদের মোকাবেলা করা।" আরও বলা হয়, "ধৈর্য হলো বিনা অভিযোগে বিপদের মাঝে হারিয়ে যাওয়া।" আবু উসমান ﷺ বলেন, "সত্যিকার ধৈর্যশীল হলো সেই ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে অভ্যস্ত করে নিয়েছে।"

আরও বলা হয়, "ধৈর্য হলো কঠিন সময়কে সে রকম হাসিমুখে মোকাবেলা করা, যেমনটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে করা হয়।" এর অর্থ হলো, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপদ উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাই সুখের সময়ে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে আর বিপদের সময় ধৈর্য ধরতে হবে।

আমর ইবনু উসমান আল-মাক্কি ﷺ বলেন, "ধৈর্য হলো আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে দৃঢ়পদ থাকা। আর তাঁর প্রেরিত বিপদকে ধীরস্থিরতার মধ্য দিয়ে স্বাগত জানানো।" এর অর্থ হলো কোনো সংকোচ, রাগ বা অভিযোগ না রেখে বিপদকে সানন্দে বরণ করে নেওয়া।

খাওয়াস ﷺ বলেন, "ধৈর্য হলো দৃঢ়ভাবে কুরআন ও সুন্নাহর নিয়মনীতি মেনে চলা।" রুওয়াইম ﷺ বলেন, "ধৈর্য হলো অভিযোগ ত্যাগ করা।" এভাবে তিনি ফলাফলের মাধ্যমে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

অন্যেরা বলেন, "ধৈর্য হলো আল্লাহর সাহায্য কামনা।" আবু আলি ﷺ বলেন, "ধৈর্য হলো এর নামেরই মতো।"[২৯৪]

আলি ইবনু আবি তালিব ﷺ বলেন, "ধৈর্য হলো এমন এক ঘোড়া, যা হোঁচট খায় না বা টলমল করে না।"

আবু মুহাম্মাদ আল-জারিরি ﷺ বলেন, "ধৈর্য হলো মনকে শান্ত রেখে বিপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থার মাঝে কোনো পার্থক্য না করা।" আমি বলি, এর না দরকার আছে আর না এটি সম্ভব। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিই করেছেন এমনভাবে যে, আমরা এ দুই অবস্থার মাঝে পার্থক্য করেই থাকি। যেটা দরকার তা হলো, আত্মাকে হতাশা ও অভিযোগপ্রবণতা থেকে বিরত রাখা। ধৈর্যের চেয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেশি সহজ যেমনটা নবীজি ﷺ তাঁর বিখ্যাত দু'আয় বলেছেন, "আপনি যতক্ষণ আমার প্রতি

---

[২৯৪] লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) এর আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, সবর হলো খুব তিতা একটি ওষুধের নাম

রাগান্বিত নন, ততক্ষণ আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। কিন্তু আমি আপনার দেওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা অধিক কামনা করি।"[২৯৫]

তাঁর আরেক হাদীস, "ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও মহত্তর উপহার কাউকে দেওয়া হয়নি।"[২৯৬] এর সাথে আগের হাদীসটির কোনো বিরোধ নেই। কারণ, বিপদ আসার পর বান্দার পক্ষে করণীয় শ্রেষ্ঠতম কাজ হলো ধৈর্যধারণ করা। কিন্তু বিপদ আসার আগে স্বাচ্ছন্দ্যই তার জন্য উত্তম।

আবু আলি আদ্দাক্কাক ﷺ বলেন, "ধৈর্যের সংজ্ঞা এই যে, আপনি তাকদীরের ব্যাপারে অভিযোগ করবেন না। তবে অভিযোগ না করেই বিপদের ফলাফলগুলো প্রকাশ করা ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আইয়ুব ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল'[২৯৭] যদিও আইয়ুব ﷺ বলেছিলেন, 'আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি।'[২৯৮]"

আমার মতে, তিনি শব্দটিকে এর ফলাফলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। "অভিযোগ না করেই" কথাটার ব্যাপারে বলা যায়, অভিযোগ দুই প্রকারের :

একটি হলো, আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা। এর সাথে ধৈর্যের কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। ইয়াকুব ﷺ বলেছেন, "আমি আমার দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর কাছেই অভিযোগ পেশ করছি।"[২৯৯] অথচ তিনি আগেই বলেছেন, "উত্তম ধৈর্য (ধারণ করব আমি)।"[৩০০] আর আল্লাহ তাঁকে বর্ণনা করেছেন ধৈর্যশীল ব্যক্তি বলে।

ধৈর্যশীলদের নেতা নবীজি ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছেই আমার অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার ব্যাপারে অভিযোগ করছি..."[৩০১]

---

[২৯৫] তাবারানি : খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৭৩, হাদীস নং ১৮১। তাইফ থেকে তিনি ফিরে আসার পর এই বিখ্যাত দু'আ করেন।

[২৯৬] *বুখারি* : ১৪৬৯-৬৪৭০; *মুসলিম* : ১০৫৩; আবু সাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত।

[২৯৭] সূরাহ সোয়াদ, ৩৮ : ৪৪

[২৯৮] সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮৩

[২৯৯] সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ৮৬

[৩০০] সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ১৩, ৮৩

[৩০১] তাইফ থেকে ফিরে আসার পর করা দু'আর অংশ; অনুরূপ, ফুটোনোট : ২৩। পূর্ণ দু'আটির অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছেই আমার অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার ব্যাপারে অভিযোগ করছি। হে আরহামুর রাহিমীন, হে মাযলুমদের প্রতিপালক, আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন? আমাকে অসন্তোষ সহকারে অভিবাদন

মূসা عليه السلام বলেছেন, "হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনার। আপনার নিকটই অভিযোগ পেশ করা হয়। আপনিই সাহায্যকারী, আপনার কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়। আপনার উপরই নির্ভর করা হয়। আপনি ছাড়া আর কারও শক্তি ও ক্ষমতা নেই।"

দ্বিতীয় প্রকার হলো, বিপদের ব্যাপারে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির অভিযোগপ্রবণ হয়ে ওঠা। সে মুখে বলার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ও এসব অভিযোগ করতে পারে। এটি ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা আর বিপদের ব্যাপারে অভিযোগ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরা পরে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

বলা হয়, "ধৈর্য হলো আত্মার সাহস।" এখান থেকেই "সাহস হলো একটি ঘণ্টার জন্য ধৈর্য প্রদর্শন করা" কথাটির উদ্ভব। বলা হয়, "ধৈর্য হলো টালমাটাল সময়ে অন্তরের স্থিরতা।"

ধৈর্য আর হতাশা পরস্পর বিপরীত। দুটি পরস্পরবিরোধী প্রসঙ্গে এ দুটির কথা বলা হয়েছে :

"(জাহান্নামিরা বলবে)...'আমরা হতাশ হই বা ধৈর্যধারণ করি, আমাদের আর কোনো নিষ্কৃতি নেই।'"[৩০২]

হতাশা হলো অক্ষমতা ও পথহারানোর সঙ্গী। ধৈর্য হলো বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সঙ্গী। হতাশাকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো, "তোমার পিতা কে?" তাহলে সে বলত, "অক্ষমতা।" আর ধৈর্যকে একই প্রশ্ন করা হলে সে বলত, "বিচক্ষণতা।"

আত্মা হলো বান্দার বাহন, যার উপর ভর করে সে হয় জান্নাতে যায়, নয়তো জাহান্নামে। ধৈর্য হলো সেই বাহনের লাগাম। এই লাগাম না থাকলে বাহনটি লক্ষ্যহীনভাবে এদিক-সেদিক দৌড়ে বেড়াত।

একটি খুতবায় হাজ্জাজ বলেন, "এই আত্মাগুলোর লাগাম টেনে ধরো। কারণ, তারা মন্দ কাজে ঢুকে পড়ে। আল্লাহ তার উপর রহম করুন যে তার আত্মার উপর লাগাম পরিয়ে একে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে সরিয়ে এনে আল্লাহর আনুগত্যে

জানানোদের থেকে অনেক দূরবর্তী কারও হাতে, না শত্রুদের হাতে? আপনি যতক্ষণ আমার প্রতি রাগান্বিত নন, ততক্ষণ আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। কিন্তু আমি আপনার দেওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা অধিক কামনা করি। আমি আপনার নূরে আশ্রয় গ্রহণ করছি, যা ছায়াকে আলোকিত করে দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ সমাধা করে দেয়, এই নিশ্চয়তায় যে আপনার ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি আমার উপর অবতরণ করবে না। সকল শক্তি-ক্ষমতা আপনার পক্ষ থেকেই।"

[৩০২] সূরাহ ইবরাহীম, ১৪ : ২১

প্রবেশ করায়। জেনে রেখো, আল্লাহর শাস্তি ভোগ করার চেয়ে তাঁর নিষেধকৃত বস্তুগুলো থেকে ধৈর্য ধরে বিরত থাকা বেশি সহজ।"

আমি বলি, আত্মার ক্ষমতা রয়েছে দৌড়ে বেড়ানোর ও বিরত থাকার। ধৈর্যের আসল রূপ হলো, উপকারী জিনিসের দিকে আত্মাকে দৌড়ে নেওয়া আর ক্ষতিকর জিনিস থেকে একে বিরত রাখা।

কিছু মানুষ উপলব্ধি করে যে ধৈর্য ধরে উপকারী কাজ করতে থাকার চেয়ে ধৈর্য ধরে ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকা বেশি কঠিন। ফলে তারা আল্লাহর হুকুম পালন করে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহর নিষেধকৃত কাজেও জড়িয়ে পড়ে। আরেক দল মানুষের কাছে আবার হারাম জিনিস থেকে দূরে থাকা সহজ, কিন্তু আল্লাহর আদেশগুলো পালন করা কঠিন। আরেক দলের কাছে দুটিই কঠিন।

শ্রেষ্ঠতম মানুষ হলো এই দুটি বিষয়েই ধৈর্যধারণকারী। অনেকেই শীতগ্রীষ্ম-নির্বিশেষে রাতে তাহাজ্জুদ আর দিনের বেলা সওম পালন করে, অথচ দৃষ্টি অবনত রাখতে হিমশিম খায়। অনেকে দৃষ্টি সহজেই অবনত রাখতে পারে, কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং জিহাদ করতে অপারগ হয়। অধিকাংশ মানুষ উভয় ব্যাপারেই অধৈর্য। খুব কম মানুষ উভয় ব্যাপারেই যথাযথ ধৈর্যশীল।

বলা হয়, "কামনা-বাসনার সম্মুখে বুদ্ধি-বিবেচনা ও দ্বীনদারি অবিচল রাখার নামই ধৈর্য।" এর অর্থ হলো, লোভনীয় জিনিসের দিকে ছুটে বেড়ানোই মানুষের বাতিক। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা আর ধার্মিকতা এতে বাধা দেয়। ফলে দুই পক্ষ এক চিরন্তন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। একবার এই পক্ষ, আরেকবার ওই পক্ষ জেতে। অন্তর, ধৈর্য, সাহস ও দৃঢ়তা হলো যুদ্ধক্ষেত্র।[৩০৩]

[৩০৩] ইবনুল কাইয়্যিম, ইদাতুস সবিরীন ওয়া যাকিরাতুশ শাকিরীন

পরিশিষ্ট তিন
বিপদ-আপদের ফযিলত
আল-ইযয ইবনু আব্দুস সালাম ﷺ

বিপদ, পরীক্ষা, দুর্ভাগ্য আর দুর্যোগের মাঝে রয়েছে অনেক উপকারিতা। বিভিন্ন মর্যাদার মানুষের উপর এ সকল উপকারিতা বিভিন্ন মাত্রায় প্রযোজ্য।

১। আল্লাহর প্রভুত্ব ও সর্বব্যাপী ক্ষমতার ব্যাপারে উপলব্ধি জন্মানো।

২। বান্দার নগণ্যতা উপলব্ধি করা।

৩। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইখলাস বাস্তবায়ন। কারণ, এই অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে যাওয়ার থাকে না, তিনি ছাড়া আর কেউ বিপদ সরাতে পারে না।

৪। অনুতপ্ত হয়ে অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফেরানো।

৫। বিনয় অবলম্বন ও দু'আ করতে পারা।

৬। সহনশীলতা।[৩০৪] সহনশীলতার মর্যাদা বিপদের ভয়াবহতা অনুসারে বাড়ে-কমে। ভয়াবহতম দুর্যোগে সহনশীলতা প্রদর্শন হলো এর উত্তম রূপ।

৭। বিপদের মুখে ধৈর্যধারণ ও দৃঢ়তা প্রদর্শন। এতে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় ও নেকি লাভ হয়।

৮। নানা রকম উপকারিতার কারণে বিপদের আগমনে আনন্দ অনুভব করা।

৯। নানা রকম উপকারিতার কারণে বিপদের আগমনে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। এটি হলো রোগাক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলার কারণে ডাক্তারের প্রতি রোগীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মতো, যদিও এর ফলে তাকে বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে হয়েছে।

১০। গুনাহ মাফ পাওয়া।

---

[৩০৪] **হিল্ম** : তাড়াহুড়া ত্যাগ করা। রাগিব, *আল-মুফরাদাতে* বলেন, "এটি হলো রাগের সময় নাফস ও মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ক্ষমতা।" জাহিয, *তাহাযিবুল আখলাকে* বলেন, "এটি হলো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চরম রাগের সময় প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।" জুরজানি, *আত-তারিফাতে* বলেন, "এটি হলো রাগের সময় শান্ত থাকা।"

১১। বিপদগ্রস্তদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারা।

১২। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিয়ামাত যথাযথভাবে উপলব্ধি করা। কারণ, হারিয়ে ফেলার আগে কেউ ঠিকমতো নিয়ামাতের মূল্য বোঝে না।

১৩। এই বিপদের বিনিময়ে আখিরাতে আল্লাহ কত পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন, তা চিন্তা করা।

১৪। এর নানা লুক্কায়িত উপকারিতা আবিষ্কার করা। যেমন : সারাহকে (আলাইহাস সালাম) ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অত্যাচারী বাদশা তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সময় উপহার হিসেবে দেন দাসী হাজারকে (আলাইহাস সালাম)। তাঁর গর্ভেই জন্ম হয় ইবরাহীম ﷺ-এর ছেলে ইসমাঈল ﷺ, যার বংশ থেকে এসেছেন রাহমাতাল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ ﷺ। বিপদের ফলাফল কতই-না উত্তম!

১৫। বিপদের ফলে মানুষ মন্দকাজ, বিলাসিতা, অহংকার, লোকদেখানো, অপচয় ও অত্যাচার থেকে বিরত থাকে। এ কারণেই সবচেয়ে বেশি বিপদ দেওয়া হয়েছে নবীগণকে, তাঁদের পর সৎকর্মশীলগণকে, এভাবে একে একে তাঁদের সবচেয়ে নিকটবর্তী মর্যাদার মানুষগণকে।[৩০৫] তাঁদের পাগল, জাদুকর, গণক বলা হয়েছিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছিল। সাহাবাগণকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তাঁদের বিপদ আর শত্রুসংখ্যা বাড়তেই থাকে। কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা পরাজিত হন। উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে অনেকে শহীদ হন। রাসূল ﷺ মুখে আঘাত পান, দাঁত ভেঙে যায়, হেলমেট ভেঙে মাথায় গেঁথে যায়। তাঁর শত্রুরা আনন্দিত হয় আর সঙ্গীরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা এক অনিঃশেষ দারিদ্র্য, দুর্দশা ও ভয়ের অবস্থায় থাকতেন। ক্ষুধার জ্বালায় তাঁরা পেটে পাথর বেঁধেছেন[৩০৬] আর দো-জাহানের সর্দার কখনো এক দিনে দুবার পেট পুরে রুটি খাননি।[৩০৭] তাঁকে মানসিকভাবে এমনই আঘাত করা হয়েছে যে, তাঁর পবিত্রা স্ত্রীকে চরিত্রহীনতার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। নবী-রাসূল ও সৎকর্মশীল সকলকেই বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রত্যেকের বিপদ ছিল তাঁর মর্যাদার অনুপাতে। তাঁদের কাউকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, কিন্তু এতে তাঁদের ঈমান টলে যায়নি। বিপদ-আপদের কারণে বান্দা আল্লাহ আযযা ওয়া

---

[৩০৫] আহমাদ : ১৪৮১-১৪৯৪-১৫৫৫-১৬০৭; তিরমিযি : ২৪০০; ইবনু মাজাহ : ৪০২৩; সাইদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিরমিযি একে হাসান সহীহ বলেছেন; হাকিম : ১২০ একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবি একমত।

[৩০৬] *বুখারি* : ৬৪৫২; আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত।

[৩০৭] *মুসলিম* : ২৯৭০; আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত।

জাল্লার দিকে ফিরে যায়।[৩০৮] সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে থাকলে বান্দা আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। এ কারণেই নবীগণ অল্প খেতেন, অনাড়ম্বর পোশাক পরতেন, যাতে তাঁরা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে থাকতে পারেন।

১৬। বিপদে এমন সন্তুষ্ট থাকা যে, এর ফলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। কারণ, সৎকর্মশীল ও পাপাচারী উভয়কেই বিপদ দেওয়া হয়। বিপদের আগমনে যে রুষ্ট হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তার পরিণতি খারাপ। আর যে এতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, যা জান্নাত ও এর সকল নিয়ামাতের চেয়ে উত্তম।[৩০৯]

---

[৩০৮] মুনাওয়ি, *ফাইদুল কাদির* : খণ্ড ১, ২৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন, "গাযালি বলেছেন, 'তুমি যদি দেখো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা পৃথিবীকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলছেন, তাহলে জেনে রেখো, তাঁর কাছে তোমার মর্যাদা বিশাল। জেনে রেখো, তিনি তোমার সাথে সে রকম আচরণ করছেন, যেমন আচরণ করেছেন তাঁর আউলিয়াগণের সাথে এবং নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বান্দাদের সাথে। আর তিনি তোমাকে দেখেশুনে রাখছেন। তুমি কি তাঁর বাণী শোনোনি? "তুমি ধৈর্যধারণ করে তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকো, কারণ তুমি তাঁর দৃষ্টির সামনেই আছো।" [সূরাহ আত-তূর, ৫২ : ৪৮] অতএব, নিজের উপর এই মহান অনুগ্রহ স্বীকার করো।'"

[৩০৯] *ফাওয়াইদুল বালওয়া ওয়াল মিহান* থেকে সংক্ষেপিত। পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৪ সালে দারুস সুন্নাহ পাবলিশার্স, বার্মিংহাম, ইউনাইটেড কিংডম থেকে Trials & Tribulations: Wisdom & Benefits শিরোনামে।

পরিশিষ্ট চার

মোল্লা আলি আল-কারি ﵀-এর ব্যাখ্যা

আল-মিশকাত, ৫৩০২ এ বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস ﵄-এর সেই হাদীস, যেখানে তিনি বলেন, "আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম। এ সময় তিনি বলেন, 'বালক, আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তোমার আগে পাবে। যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। জেনে রেখো, সমগ্র জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। আর যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে।'"

আলি আল-কারি ﵀, *মিরকাতুল মাফাতিহ শারহ মিশকাতুল মাসাবিহ* : খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৬তে লেখেন :

"'আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম' এ থেকে বোঝা যায় ইবনু আব্বাস ﵄ ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রেখেছেন, কথাগুলো মাথায় গেঁথে নিয়েছেন এবং সঠিকভাবে সেগুলো পৌঁছে দিয়েছেন। এই হাদীস তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন। এ ছাড়া বেশির ভাগ হাদীসই তিনি অন্য বর্ণনাকারীর মাধ্যম হয়ে বর্ণনা করেছেন। তবে সাহাবির মুরসাল হাদীস বলে সেগুলোকে গ্রহণ করা হয়। এর কারণ, তিনি নবীজি ﷺ-এর জীবদ্দশায় খুবই কমবয়সী সাহাবি ছিলেন। লেখক (বাগাওয়ি) বলেন, তিনি হিজরতের তিন বছর আগে জন্ম নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় তেরো বছর বয়সী ছিলেন। অন্য কারও মতে তাঁর বয়স ছিল পনেরো, আরেক মত অনুযায়ী দশ। এ সত্ত্বেও তিনি বিরাট আলেমে পরিণত হন এবং এই উম্মাতের জন্য জ্ঞানের সাগর হয়ে যান। কারণ, রাসূল ﷺ দু'আ করেছিলেন যেন তিনি ﵄ প্রজ্ঞা[৩১০], বুঝ ও সঠিক

---

[৩১০] *বুখারি* : ৭৫-১৪৩-৩৭৫৬-৭২৭০; ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত।

অর্থের জ্ঞান[৩১১] লাভ করেন। তিনি দুইবার জিবরীল (ﷺ)-কে দেখেন[৩১২] এবং জীবনের শেষপ্রান্তে অন্ধ হয়ে যান। ৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে আয-যুবাইর (رضي الله عنه)-এর শাসনামলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অনেক সাহাবা ও তাবিঈন তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

"বালক" সম্বোধনটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কথার দিনে মনোযোগ দিতে উৎসাহ দিচ্ছেন। *আল-আযকার* গ্রন্থে এর পরের অংশ আছে এভাবে, "আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দেবো..." অর্থাৎ, এমন কিছু শিক্ষামূলক কথা, যা বিপদ দূর করতে ও নিয়ামাত লাভ করতে সহায়ক হবে।

"আল্লাহকে হেফাজত করো" অর্থ তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলো। "তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন" অর্থ তিনি দুনিয়ায় তোমাকে বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাবেন। আর আখিরাতে নানা রকম শাস্তি ও জাহান্নামের নানা স্তর থেকে বাঁচাবেন। এক যথাযথ প্রতিদান। কারণ, যে আল্লাহর জন্য, আল্লাহ তার জন্য।

"আল্লাহকে হেফাজত করো" অর্থ তাঁর অধিকার সংরক্ষণ করো। সব সময় তাঁকে স্মরণ করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। "তুমি তাঁকে তোমার আগে পাবে" বা তাঁকে তোমার সামনে পাবে। তুমি যদি তা করো, তাহলে যেন আল্লাহকে তোমার সামনেই উপস্থিত পাবে। ইহসান, ইয়াকীন ও ঈমানের মাধ্যমে তুমি তাঁকে নিজের চোখে দেখার মতো করেই দেখতে পাবে। তাঁর উপস্থিতিতে আশপাশের সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্রথমটি হলো মুরাকাবা পর্যায়, দ্বিতীয়টি মুশাহাদাহ পর্যায়। এর অর্থ হিসেবে আরও বলা হয়, যদি তুমি আল্লাহর আনুগত্য করো, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন, তোমার কাজকর্মে সাহায্য করবেন। আরও বলা হয়, তুমি তাঁর গায়েবি সাহায্য ও দয়াকে সব সময় কাছে পাবে। তিনি সর্বাবস্থায় তোমার যত্ন নেবেন। তিনি তোমাকে সব রকম ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে সব রকমের পুরস্কার ও অনুগ্রহ দান করবেন। এটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করে :

"আমি তার কণ্ঠনালির চেয়েও অধিক নিকটে।"[৩১৩]

একজন জ্ঞানী বলেছেন, প্রতিটি অণুই নূরুন আলা নূরের (আল্লাহর) কাছে ঘেরাও ও অনুগত হয়ে আছে। তিনি শুধু জ্ঞানের মাধ্যমে, একে অস্তিত্বে আনার

---

[৩১১] আহমাদ : ২৩৯৭-২৮৭৯-৩০৩২-৩১০২, যার ইসনাদ আরনাউতের মতে মুসলিমের শর্ত পূরণ করে। একে সহীহ বলেছেন ইবনু হিব্বান : ৩৭১১; ইবনু খুযাইমাহ : ২৭৩৬ এবং হাকিম : ৬২৮০ (যাহাবি একমত)

[৩১২] তিরমিযি : ৩৮২২; তিনি একে মুরসাল বলেছেন।

[৩১৩] সূরাহ ক্বফ, ৫০ : ১৬

মাধ্যমেই নন, বরং এমন প্রকৃতিতে এদের নিকটবর্তী, যার আসল প্রকৃতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব :

তাঁর আলোতে সব হারিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় যখন

"আমায় ডাকো, আমি কাছে" বলেন তিনি তখন।

তিবি ﷺ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহর অধিকারগুলো সাবধানে সংরক্ষণ করো আর তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করো, তাহলে তাঁকে তোমার সামনে পাবে। আল্লাহ তা'আলার অধিকার সংরক্ষণ করো, তিনি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ থেকে বাঁচাবেন।"

"যখন চাইবে" অর্থাৎ যখন দু'আ করার ইচ্ছা করবে, শুধু "আল্লাহর কাছেই চাইবে।" সকল রিযকের ভান্ডার, সব পুরস্কারের চাবি তাঁর হাতেই। দুনিয়া ও আখিরাতে যে অনুগ্রহ বা শাস্তিই বান্দাকে স্পর্শ করে বা তার থেকে দূর হয়ে যায়, তা আল্লাহর নিঃস্বার্থ দয়ার কারণেই। কারণ, তিনিই পরম দাতা, অমুখাপেক্ষী, প্রাচুর্যশালী, যিনি কখনো অভাবগ্রস্ত হবেন না। তাই তাঁর দয়াই চাইতে হবে, তাঁর শাস্তিকেই ভয় পেতে হবে। বিপদের সময় তাঁর কাছেই আশ্রয় নিতে হবে, সকল বিষয়ে তাঁর উপরই নির্ভর করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারও কাছে চাওয়া যাবে না, কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ উপকার বা ক্ষতি করতে বা আটকে রাখতে পারে না। "তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের ক্ষতি বা উপকার করার এবং তারা ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন বা পুনরুত্থানের উপর।"[৩১৪] সকল অবস্থায় তাঁর কাছেই চাইতে হবে, হোক তা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে।

হাদীসে এসেছে, "যে আল্লাহর কাছে চায় না, তার প্রতি তিনি রাগান্বিত হন।"[৩১৫] চাওয়ার মাধ্যমে যার কাছে চাওয়া হচ্ছে, তার প্রতি প্রার্থীর মুখাপেক্ষিতা, অক্ষমতা ও প্রয়োজন প্রকাশ পায়। ফলে শক্তি-ক্ষমতা প্রদর্শনের বদলে চরম বিনয় ও অভাব প্রকাশ করে। কবি চমৎকার বলেছেন,

আল্লাহ রেগে যান তাঁর কাছে না চাইলে

---

[৩১৪] সূরাহ আল-ফুরকান, ২৫ : ৩

[৩১৫] আহমাদ : ৯৭০১; তিরমিযি : ৩৩৭৩; ইবনু মাজাহ : ৩৮২৭; আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। এর ইসনাদকে যঈফ বলেছেন যাহাবি, *আল-মিযান* : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫২৮ এবং আরনাউত ও অন্যান্যরা, কিন্তু অন্যান্য হাদীসের সমর্থনের কারণে আলবানি, *আস-সহীহাহ* : ২৬৫৪ তে একে হাসান বলেছেন।

আদমসন্তান রাগে তার কাছে চাইলো।

"যখন সাহায্য চাইবে" অর্থাৎ আল্লাহ আনুগত্য করার বা দুনিয়া ও আখিরাতের যেকোনো বিষয়ে সাহায্য চাওয়া। "আল্লাহর দিকেই ফিরবে", কারণ তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী, সব সময় ও সব জায়গায় তাঁর উপরই আস্থা রাখতে হবে।

"জেনে রেখো" কথাটি বলা হয়েছে জোর দেওয়ার জন্য এবং যা বলা হচ্ছে তার দিকে মনোযোগ ফেরানো ও তা থেকে আরও উপকৃত হওয়ার জন্য। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, "সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে" "তোমার কোনো উপকার" করার জন্য, তাহলে "ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন", অর্থাৎ যতটুকু তিনি তাকদীরে লিখেছেন। "আর যদি তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়" বা উপকার অপসারণ করতে চায়, তাহলে "ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।" সারকথা হলো, তুমি কী চাও, আর কী চাও না–এ ব্যাপারে আল্লাহকেই একক ক্ষমতাবান বলে মানতে হবে। তিনিই ক্ষতি বা উপকার পৌঁছান। তিনিই দান করেন ও দান করা থেকে বিরত থাকেন। এক আসমানি কিতাবে আছে, "আমার শক্তি ও জালালের কসম! যে আমাকে ছাড়া অন্য কারও উপর আশা স্থাপন করে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবো। আমি তাকে তার সহচরদের মধ্যে পরাধীনতার পোশাক দিয়ে ঢেকে দেবো, আর আমি তাকে আমার উপস্থিতি থেকে দূরে ঠেলে দেবো আর আমার কাছে পৌঁছতে তাকে বাধা দেবো। আমি তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও হতবিহ্বল করে দেবো। বিপদের সময় সে আমাকে ছাড়া অন্যদের কাছে আশা করবে, অথচ সকল বিপদ আমার হাতে। আমি চিরঞ্জীব, অমুখাপেক্ষী। সে অন্যদের দরজায় কড়া নাড়বে অথচ সকল দরজার চাবি আমার হাতে। তাদের দরজা বন্ধ, অথচ যারা আমাকে ডাকে তাদের জন্য আমার দরজা সর্বদা খোলা।"

"কলম তুলে নেওয়া হয়েছে" এবং আর কোনো তাকদীর লেখা হবে না। "আর" কিয়ামাত পর্যন্ত সকল মাখলুকের ফায়সালা লিখে "পাতাগুলো শুকিয়ে গেছে"। নতুন কিছু লেখার জন্য বা আগের লেখা পাল্টানোর জন্য নতুন কোনো কলম চালানো হবে না। লাওহে মাহফুযে সব লেখা হয়ে গেছে, নতুন করে কিছু লেখা হবে না। দুনিয়ার জীবনে একজন লেখকের বই লেখা শেষ করার সাথে তুলনা করে কলম তুলে নেওয়া এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে যাওয়ার উপমা দিয়ে তাকদীরের কথা বোঝানো হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে এই হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছি, "আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে একে আদেশ দিলেন, 'লেখো'। সে সময় তা সেই সবকিছু লিখে ফেলল,

যা কিয়ামাত পর্যন্ত ঘটবে।"[৩১৬] এ ছাড়াও আমরা কলম শুকিয়ে যাওয়ার হাদীস ব্যাখ্যা করেছি যে, আল্লাহর জ্ঞানের শান অনুযায়ী, তিনি অনাদিকাল আগেই তাকদীর জানেন। এর সাথে এই আয়াতের কোনো বৈপরীত্য নেই :

"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন নিশ্চিহ্ন করে দেন আর যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। উম্মুল কিতাব তাঁর নিকটই রক্ষিত।"[৩১৭]

কী মুছে দেওয়া হবে আর কী সংরক্ষণ করা হবে—তাও কলম শুকিয়ে যাবার আগে লিখে রাখা হয়েছে। লাওহে মাহফুয অনুযায়ী তাকদীর দুই রকমের—অপরিবর্তনীয় ও শর্তনির্ভর। আল্লাহ যা জানেন, তা পরিবর্তিত হয় না। কারণ, আল্লাহ বলেন :

"উম্মুল কিতাব তাঁর নিকটই রক্ষিত।"[৩১৮]

আরও বলা হয়, আল্লাহর নিকট দুটি কিতাব সংরক্ষিত। একটি লাওহে মাহফুয, যা পরিবর্তিত হয় না। আরেকটি হলো যাতে ফেরেশতারা লিখছেন এবং তাতে মোছা হয় ও পরিবর্তন করা হয়।

হাদীসের এই অংশটি *তিরমিযি* ও *আহমাদ* থেকে বর্ণিত। প্রথমজন একে হাসান সহীহ বলেছেন বলে ইমাম নববী ﷺ উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি বলেন :

"তিরমিযির বাইরে আরেক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে জানো, তাহলে তোমার দুর্দশার সময় তিনি তোমাকে জানবেন। জেনে রেখো, যা তোমার উপর আপতিত হয়নি, তা কখনোই হওয়ার ছিল না; আর যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল।' এটি শেষ হয় এভাবে, 'জেনে রেখো, বিজয় আসে ধৈর্যের সাথে, মুক্তি আসে বিপদের সাথে, আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা।'"

"আল্লাহকে জানো" জ্ঞানের মাধ্যমে আসে ভালোবাসা। তাহলে অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর দেওয়া নিয়মনীতির হেফাজত করার মাধ্যমে নিজেকে তাঁর প্রিয় করে নাও। এই ব্যাখ্যা নববী ﷺ করেছেন, "তিনি তোমার দুর্দশার সময় তোমাকে জানবেন" অর্থাৎ তিনি তোমাকে অক্ষত অবস্থায় এর মধ্য দিয়ে পার করে নেবেন।

---

[৩১৬] আহমাদ : ২২৭০৫-২২৭০৭; আবু দাউদ : ৪৭০০; তিরমিযি : ২১৫৫-৩৩১৯; তিরমিযি একে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। একে সহীহ বলেছেন ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুরআন* : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৫, আলবানি, *আস-সহীহাহ* : ১৩৩ এবং আরনাউত।

[৩১৭] সূরাহ আর-রা'দ, ১৩ : ৩৯

[৩১৮] সূরাহ আর-রা'দ, ১৩ : ৩৯

"জেনে রেখো" নিয়ামাত, স্বাচ্ছন্দ্য, বিপদ, দুর্দশার মধ্যে "যা তোমার উপর আপতিত হয়নি, তা কখনোই হওয়ার ছিল না।" এটি অসম্ভব। "আর যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল।" এই বাক্যগুলো আল্লাহর উপর নির্ভরতা বাড়ায়। সন্তুষ্টির অবস্থা তৈরি হয়। নিজেকে শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী ভাবা থেকে বিরত রাখে। সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, সহজতা-কাঠিন্য, লাভ-ক্ষতি, হায়াত, রিযক-সংক্রান্ত যা কিছুই ঘটুক না কেন, তা আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাকদীরে লিখিত হয়ে গেছে। স্থিতি আর গতি একই। সুখের সময় কৃতজ্ঞতা আর দুখের সময় ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন : "বলো, 'এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।'"[৩১৯]

"জেনে রেখো" শত্রুর বিরুদ্ধে "বিজয় আসে" বিপদ-আপদের সময়ে "ধৈর্যের সাথে।" দুঃখ থেকে "মুক্তি আসে বিপদের সাথে", যা একদম মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে। "আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা।" এটি কুরআনেরও আয়াত, যা দুইবার বলা হয়েছে। অতএব জানা গেল যে, একটি কষ্টের সাথে দুটি স্বস্তি আসে। জানা আছে যে, একই অনির্দিষ্ট বিশেষ্য যদি দুবার বলা হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি ও প্রথমটি একই নয়। একটি নির্দিষ্ট বিশেষ্য যদি দুবার বলা হয়, তাহলে দুটি একই। কিন্তু এ মূলনীতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"বলো, 'হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছে রাজত্ব দেন। আর যার থেকে ইচ্ছে রাজত্ব কেড়ে নেন...'"[৩২০]

সন্দেহ নেই যে প্রথমবারে নির্দিষ্ট বিশেষ্য পদ 'আল-মুলক' (রাজত্ব) দিয়ে সকল বিষয় বোঝানো হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বারে একই নির্দিষ্ট বিশেষ্য পদ ব্যবহার করে রাজত্বের নির্দিষ্ট প্রকার বোঝানো হয়েছে, যা আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে।

বলা হয়, হাদীসটিতে মা'আ (সাথে) বলতে বোঝানো হয়েছে বা'দ (পরে)। কিন্তু এটি এর মূল অর্থ থেকে অনেক দূরে। এ ব্যাপারে আরও বলা হয় যে, এরা এত কাছাকাছি চলে যে, একটির পর আরেকটি এলেও এদের একসাথে ধরা যায়। ফলে মানুষ এ থেকে সান্ত্বনা নিতে পারে।

কিন্তু বিপদের ভেতরেই অনেক নিয়ামাত থাকে। সত্যি বলতে বিপদ নিজেই নিয়ামাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

[৩১৯] সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ৭৮

[৩২০] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ২৬

"এতে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে ছিল মহাপরীক্ষা।"[৩২১]

"এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে, যারা ধৈর্যশীল। এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে, যারা মহাসৌভাগ্যবান।"[৩২২]

ফুতুহাতুল গায়ব গ্রন্থে আল্লামা আব্দুল কাদির জিলানি ﷺ বলেন, "প্রতিটি মুমিনের উচিত এ হাদীসকে তার অন্তরের আয়নায় পরিণত করা, একে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে জানা, একে বিপদের আশ্রয় ও আলোচনার বস্তু বানানো। স্থিতি ও গতির সকল অবস্থায় তার উচিত এই হাদীসের উপর আমল করা, তাহলেই সে আল্লাহ তা'আলার রহমতে দুনিয়ায় রক্ষা পাবে আর আখিরাতে সম্মানিত হবে।"

---

[৩২১] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ৪৯
[৩২২] সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৫

পরিশিষ্ট পাঁচ

ইবনু আল্লান ﷺ-এর ব্যাখ্যা

আল-আযকার গ্রন্থে ইমাম নববী ﷺ লিখেছেন :

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, "আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম। এ সময় তিনি বলেন, 'বালক, আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিচ্ছি। আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তোমার আগে পাবে। যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। জেনে রেখো, সমগ্র জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। আর যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে।'"[৩২৩]

তিরমিযিতে এটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন। তিরমিযির বাইরে আরেক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে জানো, তাহলে তোমার দুর্দশার সময় তিনি তোমাকে জানবেন। জেনে রেখো, যা তোমার উপর আপতিত হয়নি, তা কখনোই হওয়ার ছিল না; আর যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল।' এটি শেষ হয় এভাবে, 'জেনে রেখো, বিজয় রয়েছে ধৈর্যের মধ্যে, মুক্তি আসে বিপদের সাথে, আর কাঠিন্যের সাথে আছে সহজতা।'"

আল-ফুতুহাতুর রব্বানিয়্যাহ আলাল আযকারুন নববিয়্যাহ গ্রন্থের খণ্ড ৭, ৩৮১-৩৮৯ পৃষ্ঠাতে ইবনু আল্লান ﷺ লেখেন :

"আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম" অর্থ বাহন হিসেবে ব্যবহৃত পশুর পিঠে বসা, যা অন্য আরেক বর্ণনায় (সরাসরি) রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, পশু যদি ওজন বহন করতে সমর্থ হয়, তাহলে সেটির উপর একজনের বেশি চড়া জায়েয। নবীজি ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাহাবার সাথে একই পশুর পিঠে

[৩২৩] তিরমিযি : ২৫১৬; তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন।

চড়েছেন। তাঁদের মোট সংখ্যা চল্লিশ। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁদের তালিকা করে আমি আলাদা পুস্তিকা রচনা করেছি।[৩২৪]

"বালক" (আরবিতে "গুলাম") শব্দটি আরেক বর্ণনায় ক্ষুদ্রতা প্রকাশকারী "গুলাইম" হিসেবে এসেছে, যা স্নেহবশত ব্যবহার করা হয়। অথবা এখানে এটি সম্মান প্রদর্শনার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে, যার অর্থ হলো ইবনে আব্বাস ﷺ ভবিষ্যতে কী হতে চলেছেন, তা বিবেচনায় রেখে বলা। দুধ পান শুরু করা থেকে নয় বছরের নিচের বয়সী বাচ্চাদের গুলাম বলা হয়। এই উপদেশ প্রদানের সময় ইবনে আব্বাস ﷺ-এর বয়স দশের আশপাশে হয়ে থাকবে। নবীজি ﷺ-এর মৃত্যুর সময় ইবনু আব্বাস ﷺ-এর বয়স ছিল দশ বা তেরো বছর।

"আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিচ্ছি", যা উপকারী। আরেক বর্ণনায় এটি সরাসরি উল্লেখিত হয়েছে, "যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার উপকার করবেন"। এর উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাকে বক্তব্য শুনতে প্রস্তুত করা, যাতে এর প্রভাব ভালোমতো পড়ে। কারণ, এর মাধ্যমে শ্রোতা বক্তব্যের দিকে আগ্রহ নিয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেবে। "কিছু কথা" (আরবি "কালিমাত") শব্দটি স্বল্প পরিমাণ অর্থে বহুবচন। যা থেকে বোঝা যায় যে, সামনে আসন্ন কথাগুলো পরিমাণে অল্প হবে এবং মনে রাখতে সহজ হবে।[৩২৫] এই উপদেশবাণীতে অসংখ্য নিয়ম, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। এই উপদেশগুলো ইবনু আব্বাস ﷺ-কে দেওয়া থেকে বোঝা যায় যে নবীজি ﷺ জানতেন ইবনে আব্বাস ﷺ ভবিষ্যতে কতটা জ্ঞান-প্রজ্ঞা, উত্তম আচরণ এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার গভীরতা লাভ করবেন।

"আল্লাহকে হেফাজত করো" তাঁর দ্বীন ও আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে। অর্থাৎ তোমার রবকে মান্য করো, তাঁর আদেশ মেনে চলো, তাঁর নিষেধকৃত জিনিস থেকে দূরে থাকো, তাঁর সতর্কবাণীর ব্যাপারে সচেতন থাকো। যদি তা করো, তাহলে "তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন"। অর্থাৎ তোমাকে, তোমার পরিবারকে, তোমার দুনিয়ার জীবনকে, বিশেষত মৃত্যুর সময়। কারণ, যেমন কর্ম তেমন ফল। এই সংক্ষিপ্ত ও ছোট বাক্যটির মধ্যেই শরিয়তের ছোট-বড় সকল নিয়ম-কানুন চলে এসেছে। কথাটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যা বলা হচ্ছে

---

[৩২৪] পুস্তকের নাম : তুহফাতুল আশরাফ বি মারিফাতিল ইরদাফ

[৩২৫] *দালিলুল ফালিহিন* : খণ্ড ১, ১৬৬ পৃষ্ঠাতে লেখক আরও বলেন, "এদের অনির্দিষ্টরূপে উল্লেখের আরেকটি কারণ হলো এগুলো অত্যধিক এবং সত্যিকার অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ।"

তার মধ্যে ভাবগাম্ভীর্য এসেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজি ﷺ-কে অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রদানের এটি একটি উদাহরণ।[৩২৬]

"আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তোমার আগে পাবে।" অর্থাৎ সামনে পাবে, যেমনটা দ্বিতীয় বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন, ঘেরাও করে রাখবেন, তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন, তুমি যেখানেই থাকো না কেন। এর মাধ্যমে তুমি তাঁর মাঝেই শান্তি লাভ করবে। মাখলুকের বদলে তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন। এটি আগের বাক্যের উপর জোর দিচ্ছে এবং রূপক অর্থে বলা হচ্ছে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কোনো দিক দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। এটি আল্লাহর এই আয়াতের মতো "আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন"।[৫] এখানে "সঙ্গে থাকা" রূপক, কোনো বাহ্যিক দিকে তাঁকে ধারণ করা যায় না। ছয় দিকের মধ্যে সামনের দিককে উল্লেখ করার মাধ্যমে ব্যক্তির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বোঝানো হয়েছে। দেখানো হচ্ছে যে, সে আখিরাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই দুনিয়ায় সে স্থায়ী হবে না। পথিক সামনে তাকিয়ে দেখে সামনে কী আসতে চলেছে। এভাবে এ কথাটির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, তুমি যেদিকেই ফেরো উভয় দুনিয়ায় তুমি যে অবস্থার ইচ্ছা করো (তিনি তোমার সাথে আছেন)। আরও বলা হয় যে, সামনে বসা ব্যক্তিকে যেভাবে দ্রুত সংরক্ষণ ও সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়, আল্লাহ তোমাকে সেভাবে সাহায্য করবেন।

"যখন চাইবে" বা চাওয়ার ইচ্ছে করবে, শুধু "আল্লাহর কাছেই চাইবে"। সমস্ত রিযকের ভান্ডার তাঁর হাতে। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউই দান করতে বা দান আটকে রাখতে সমর্থ নয় :

"...তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা করো..."[৩২৭]

হাদীসে আছে, "যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন।"[৩২৮] আরেক হাদীসে আছে, "তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার সকল প্রয়োজন

---

[৩২৬] *বুখারি* : ২৯৭৭-৬৯৯৮-৭০১৩-৭২২৩; *মুসলিম* : ৫২৩; আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

[৩২৭] সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ৩২

[৩২৮] আহমাদ : ৯৭০১; তিরমিযি : ৩৩৭৩; ইবনু মাজাহ : ৩৮২৭; আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। এর ইসনাদকে যঈফ বলেছেন যাহাবি, *আল-মিযান* : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫২৮ এবং আরনাউত ও অন্যান্যরা। কিন্তু অন্যান্য হাদীসের সমর্থনের কারণে আলবানি, *আস-সহীহাহ* : ২৬৫৪ তে একে হাসান বলেছেন।

আল্লাহর কাছেই চাওয়া, এমনকি জুতোর ফিতা ছিঁড়ে গেলেও।"[৩২৯] মূসা -কে আল্লাহ বলেছেন,

"হে মূসা, আমার কাছেই চাও, এমনকি যদি কেবল ময়দার খামিরের জন্য লবণ প্রয়োজন হয়, তবুও।"

সকল ব্যাপারে বান্দার উচিত তার রবের উপর নির্ভর করা। কারণ, তিনি যা দেন, তা কেউ আটকে রাখতে পারে না। তিনি যা আটকে রাখেন, তা কেউ নিয়ে দিতে পারে না। তাঁর পাশাপাশি আর কারও উপর বান্দার নির্ভর করা উচিত নয়। মানুষ অবহেলার ফাঁদে পড়ে এই বাস্তবতা ভুলে বসতে পারে। এর ফলে তার হৃদয় মাখলুকের দিকে ঝুঁকে পড়বে। সে যতই এ কাজ করবে, ততই ইয়াকীনের অভাবে তার রবের থেকে দূরে চলে যাবে। বিপরীতে যারা তাওয়াক্কুল ও ইয়াকীন বাস্তবায়িত করেছে, তারা সকল মাখলুকের থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর বদান্যতার দুয়ারেই সব নিবেদন করে। যারা তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করে, তিনিই তাদের যত্ন নেবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"যে কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"[৩৩০]

"যখন সাহায্য চাইবে" যেকোনো বিষয়ে, শুধু "আল্লাহর দিকেই ফিরবে"। তুমি জানো যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বশক্তিমান আর বাকি সবাই দুর্বল। এমনকি তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি বা উপকারও করতে পারে না।[৩৩১] কারণ, এমন সত্তার কাছেই সাহায্য চাইতে হয়, যিনি সাহায্য করতে সক্ষম। আর যে "তার মনিবের উপর এক বোঝা"[৩৩২], সে তো নিজের জন্যই কিছু করতে পারে না, অন্যের জন্য কিছু করা তো অনেক পরের ব্যাপার। এমন সত্তার কাছে কী করে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে?

অতএব, শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। যা দেখা যায় তাঁর এই আয়াতে :

---

[৩২৯] তিরমিযি : ৩৬৮২, আনাস থেকে বর্ণিত; তিরমিযি একে গারীব বলেছেন।
[৩৩০] সূরাহ আত-তলাক, ৬৫ : ৩
[৩৩১] *দালিলুল ফালিহীন* : খণ্ড ১, ১৬৬ পৃষ্ঠাতে লেখক আরও বলেন, "'লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' কথাটিকে জান্নাতের একটি খাজানা বলা হয়েছে, কারণ এর মাধ্যমে বান্দা নিজেকে নিজের সকল শক্তি-ক্ষমতা থেকে মুক্ত করে নেয়।"
[৩৩২] সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ৭৬

"আর আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই।"[৩৩৩]

এখানে ক্রিয়ার (সাহায্য চাওয়া) বিধেয়কে ক্রিয়াপদের আগে আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিধেয়র উপর গুরুত্ব বোঝানো হয়।

যে তার রবের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত, সে বাস্তবিকই সাহায্যপ্রাপ্ত। আর যে তার রবের দ্বারা পরিত্যক্ত, সে বাস্তবিকই পরিত্যক্ত। উমার ইবনে আব্দুল আযীযের উদ্দেশ্যে এক চিঠিতে আল-হাসান লেখেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কারও সাহায্য চাইবেন না। না হলে তিনি আপনাকে তার হাতেই ছেড়ে দেবেন।"

নবীজি ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন সকল বিষয়ে অন্য সবার থেকে মুখ ফিরিয়ে এক রবের দিকেই আমাদের আস্থাকে ফেরানোর জন্য। তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, "জেনে রেখো, সমগ্র জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।..."

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দিতে চান, তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই..."[৩৩৪]

এর অর্থ হলো আল্লাহই যেহেতু উপকার ও ক্ষতি করার মালিক, তিনি ছাড়া আর কেউ এ ক্ষমতায় কোনো অংশের দাবিদার নয়। এটি প্রমাণিত যে, মাখলুক যত বিপদ-আপদে পড়বে, তা প্রদান করা বা আটকে রাখা কেবল আল্লাহরই হাতে। কেউ যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত রাখেননি, তাহলে ক্ষতি করতে চাওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহ লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেবেন। তিনি হয়তো তাকে অসুস্থ করে দেবেন বা ভুলিয়ে দেবেন, তার অন্তর ঘুরিয়ে দেবেন, অথবা মূল কাজটাই ব্যর্থ করে দেবেন। যেমন : তির ছুড়ে মারলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেওয়া।

এই বাক্যে তাকদীরের ভালোমন্দে বিশ্বাস করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো মাখলুকের সাথে যা-ই ঘটে, এর উপর আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোনো সত্যিকারের প্রভাব নেই। অতএব বাকি সবার থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল তাঁর

---

[৩৩৩] সূরাহ আল-ফাতিহাহ, ১ : ৫
[৩৩৪] সূরাহ ইউনুস, ১০ : ১০৭

দিকেই ফিরতে হবে। এই ইয়াকীন গড়ে তুলতে পারলে বান্দা সকল উপকার ও ক্ষতিকেই রবের পক্ষ থেকে আসা বলে মানবে এবং সকল প্রয়োজনে তাঁর কাছেই চাইবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে, এমন বিশ্বাস করা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এমন বিশ্বাস ছোট শির্ক। বরং এটি নিশ্চিতভাবেই বড় শির্ক।

"যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন... যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।" অংশটি নবীজি ﷺ-এর এই শিক্ষার প্রতিধ্বনি যে, মানুষের রিযক, আয়ু, আমল, সে কি নাজাতপ্রাপ্ত না ধ্বংসপ্রাপ্ত—তা ইতোমধ্যেই লেখা হয়ে গেছে।

"কলম তুলে নেওয়া হয়েছে" অর্থাৎ, লেখা শেষ করে কলম রেখে দেওয়া হয়েছে। যা হয়েছে ও হবে, সবই লিখিত রয়েছে এবং তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। "আর পৃষ্ঠাগুলো" যার উপরে তাকদীর লেখা হয়েছে, যেমন লাওহে মাহফুয "শুকিয়ে গেছে"। যা-ই পৃষ্ঠায় লেখা হচ্ছে, তার সম্পূর্ণ বা আংশিক কালি ভেজা ভেজা থাকে। কিন্তু তা শুকিয়ে যাওয়া মানে লেখা শেষ। তা আর মোছা যাবে না বা পরিবর্তন করা যাবে না। তাকদীর লিখিত ও নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতার একটি রূপক হিসেবে এই কথাটি বলা হয়েছে। এ এক চমৎকার রূপক। অল্প কথায় যা বলা হচ্ছে, তাতে ব্যাপক ভাবগাম্ভীর্য এনে দেয়। কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যে, এই বাস্তবতা যে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারবে এবং প্রত্যক্ষ করবে, তার কাছে মাখলুক থেকে মুখ ফিরিয়ে রবের দিকে ফেরা সহজ হয়ে যাবে।

কেউ যদি ভাবে এটি আল্লাহর এই আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক :

> **"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন নিশ্চিহ্ন করে দেন আর যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। উম্মুল কিতাব তাঁর নিকটই রক্ষিত।"**[৩৩৫]

তাহলে আমরা বলব তার এই ভাবনা ভুল। কারণ, মুছে ফেলা এবং ঠিক রাখার বিষয়টিও আগে থেকে নির্ধারিত। কারণ, তাকদীর দুই ধরনের—অপরিবর্তনীয় ও শর্তসাপেক্ষ।

"*তিরমিযি*তে এটি বর্ণিত হয়েছে।" একজন মুজতাহিদ আলিম বলেছেন, হাদীসটি ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বিভিন্নজনের মাধ্যমে কয়েকটি সূত্রে এসেছে। আলি, আবু সাইদ, সাহল ইবনু সাদ, আব্দুল্লাহ ইবনু জাফার থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সবগুলো বর্ণনাই দুর্বলতাযুক্ত। ইবনু মানদাহ ও অন্যান্যরা বলেছেন যে,

---

[৩৩৫] সূরাহ আর-রা'দ, ১৩ : ৩৯

সবচেয়ে সহীহ বর্ণনাটি রয়েছে *তিরমিযিতে*। "আর তিনি বলেছেন এটি হাসান সহীহ।" *তাখরিজুল আরবাইন* গ্রন্থে সাখাওয়ি এই ইসনাদকে সহীহ বলেছেন এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর তিনি বলেন, "মোটকথা, ইতোমধ্যে উল্লেখিত লায়লাহ এবং অন্যদের বর্ণনাসূত্রে এই হাদীসটি প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যই দিইয়া এটিকে *মুখতারাহ* গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। তিরমিযির অনুসরণে *আল-আমালি* গ্রন্থে আল-ইরাকি একে সহীহ বলেছেন। ইবনু মানদাহ বলেছেন যে, এর বর্ণনাসূত্র সুপরিচিত এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।"[৩৩৬]

"তিরমিযির বাইরে আরেক বর্ণনায়" হাদীসটি আব্দ ইবনু হুমাইদ থেকে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ একে দুটি মুনকাতি ইসনাদে বর্ণনা করেছেন :

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, "আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসে থাকা অবস্থায় তিনি বললেন, 'হে বালক, তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিই, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার উপকার সাধন করবেন?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি ﷺ বললেন, 'আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে জেনো, তাহলে তোমার বিপদের সময় তিনি তোমাকে জানবেন। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহরই কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। যা যা ঘটবে, (তা লেখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একত্র হয়ে যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায় যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায় যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ। বিজয় আছে ধৈর্যের মধ্যে, কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি, আর কাঠিন্যের সাথে আছে সহজতা।'"[৩৩৭]

উপরে লেখকের ইঙ্গিতকৃত বর্ণনার চেয়ে এই বর্ণনার শব্দগুলো অধিক পূর্ণাঙ্গ।

"আল্লাহকে জানো" কারণ কাউকে জানার মাধ্যমেই তার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। তাহলে অর্থ দাঁড়াল এই যে, "স্বাচ্ছন্দ্যের সময়" আল্লাহর আদেশ মেনে চলা ও নিষেধ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে নিজেকে প্রিয় করে নাও। "তোমার দুর্দশার সময় তিনি তোমাকে জানবেন" তোমাকে বিপদমুক্তিকে সাহায্য করার মাধ্যমে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁকে জানার

---

[৩৩৬] লেখকের *দালিলুল ফালিহীন* : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৫ থেকে কথাগুলো নেওয়া হয়েছে।
[৩৩৭] আহমাদ : ২৮০৩ এবং এটি সহীহ।

বরকতে তিনি তোমাকে প্রতিটি বিপদ, দুঃখ-কষ্টে সাহায্য করবেন এবং মুক্তির পথ করে দেবেন। এর একটি উদাহরণ হলো গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তি, যার ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও বলা হয় যে, এখানে কিছু কথা উহ্য রাখা হয়েছে। তাহলে পুরো অর্থ দাঁড়াবে "স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর ফেরেশতাদের কাছে পরিচিত করে তোলো। তাহলে তোমার দুর্দশার সময় ফেরেশতাদের সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে জানবেন।" এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেই হাদীসে যেখানে বলা হয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় দু'আকারী ব্যক্তি বিপদের সময় দু'আ করলে ফেরেশতারা বলেন, "হে রব, এটি পরিচিত কণ্ঠ"। আর যে সুখের সময় দু'আ করে না, সে বিপদের সময় দু'আ করলে ফেরেশতারা বলেন, "হে রব, এটি অপরিচিত কণ্ঠ"।[৩৩৮] তবে এই ব্যাখ্যা ত্রুটিহীন নয়। এ সংক্রান্ত হাদীসটিকে সহীহ ধরে নিলেও তা এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে না। প্রথমে উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিই অধিক সাযুজ্যপূর্ণ।

ফযিলত : বান্দার জানা সাধারণ ও বিশেষ উভয় অর্থে হতে পারে, আল্লাহর জানাও সাধারণ ও বিশেষ উভয় অর্থে হতে পারে। বান্দার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে জানার অর্থ হলো আল্লাহর একত্ববাদ, প্রভুত্ব মেনে নেওয়া এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনা। আর বিশেষভাবে জানার অর্থ হলো নিজেকে একদমই আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া, তাঁর সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভ করা, তাঁর যিকরে আনন্দ পাওয়া, তাঁর প্রতি লজ্জাবোধ করা এবং সব সময় তাঁকে উপস্থিত জানা। আল্লাহর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে জানার অর্থ হলো তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও দৃষ্টির মাধ্যমে বান্দার প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুর ব্যাপারে অবগত থাকা। বিশেষ অর্থে হলো, বান্দাকে ভালোবাসা, তাকে নৈকট্য দান করা, তার দু'আ কবুল করা ও তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। আল্লাহকে যে বিশেষ অর্থে জেনেছে, তাকেই কেবল আল্লাহ বিশেষ অর্থে জানবেন।

এরপর এই উপদেশের একদম সারনির্যাসটি বলা হয়েছে, "জেনে রেখো", তাকদীরের কারণে "যা তোমার উপর আপতিত হয়নি, তা কখনোই হওয়ার ছিল না"। কারণ, এটি অন্য কারও জন্য নির্ধারিত ছিল। আর তাকদীর অনুযায়ী "যা তোমার আপতিত হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল"। কারণ, তোমার কাছে আসাটাই এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কারও জন্য যা নির্ধারিত আছে, সেটিই কেবল তার কাছে আসবে। অর্থাৎ, ভালো-মন্দ যা কিছুই কারও উপর আপতিত হবে বা হবে না—তা আগে থেকেই নির্ধারিত। আহমাদের বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "সবকিছুরই

[৩৩৮] ইবনু রজব একে সালমান ফারসি ﷺ-এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

একটি হাকিকত রয়েছে। বান্দা ততক্ষণ ঈমানের হাকিকত অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জেনে নিচ্ছে যে—তার সাথে যা ঘটেছে, তা ঘটারই ছিল; যা ঘটেনি, তা কিছুতেই ঘটত না।"[৩৩৯]

এখানে সকল কিছু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই সমর্পণ করা এবং তাঁর উপরই নির্ভর করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অন্য সকলের শক্তি-ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। এই সাক্ষ্য দেওয়ার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যা চান তা-ই করেন এবং তাঁর নির্ধারিত তাকদীরের ঊর্ধ্বে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটি তাঁর এই আয়াতের মতো :

"পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোনো বিপদ আসে না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। এটি (করা) আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।"[৩৪০]

আমরা এই অংশটিকে পুরো হাদীসটির সারনির্যাস বলেছি, কারণ এর আগের ও পরের অংশ এর উপরই ভিত্তি করে এবং এই অংশেরই শাখা। এই বাক্যের বিষয়বস্তু যে বিশ্বাস করে সে নিশ্চিত জানবে যে, আল্লাহই উপকার বা ক্ষতি করেন, তিনিই দেন এবং তিনিই দান করা থেকে বিরত থাকেন। ফলে সে শুধু তাঁকেই মান্য করবে, তাঁর দেওয়া সীমা হেফাজত করবে, তাঁকে ভয় করবে, তাঁর প্রতি আশা রাখবে, তাঁকে ভালোবাসবে, মাখলুকের আনুগত্যের আগে তাঁর আনুগত্যকে স্থান দেবে। সে শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য চাইবে, তাঁর কাছে দু'আ করবে, বিনীতভাবে তাঁকে ডাকবে, সুখ-দুঃখ ও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে তাকদীরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে।

"জেনে রেখো, বিজয় আসে ধৈর্যের মাধ্যমে।" যখন মানুষ উপলব্ধি করবে যে, তার পুরো জীবন তাকদীর অনুযায়ী চলে, তখন নবীজি ﷺ-এর আদেশ অনুযায়ী নেককার ব্যক্তিরা সুখে-দুঃখে সব সময় সন্তুষ্ট থাকবে। আর সে যদি সন্তুষ্ট হতে অপারগ হয়, তাহলে নিজেকে ধৈর্য দিয়ে আবৃত করবে এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় থাকবে। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে রহমত, বরকত, হিদায়াত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। *তিরমিযি*তে এসেছে নবীজি ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। যে কেউ সন্তুষ্ট

---

[৩৩৯] আহমাদ : ২৭৪৯০; ইবনু আবি আসিম : ২৪৬; একে হাসান বলেছেন সুয়ূতি, *আল-জামি* : ২৪১৭ এবং ওয়াদি, *সহীহুল মুসনাদ* : ১০৫০। আলবানি, *যিলালুল জান্নাহ* : ২৪৬ এবং *আস-সহীহাহ* : ২৪৭১ এ একে শাহীদের কারণে সহীহ বলেছেন।

[৩৪০] সূরাহ আল-হাদীদ, ৫৭ : ২২-২৩

থাকে, সে সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর যে কেউ অসন্তুষ্ট হয়, সে অসন্তুষ্টি লাভ করবে।"[৩৪১]

"জেনে রেখো, বিজয় আসে ধৈর্যের মাধ্যমে" অর্থাৎ বাহ্যিক ও আত্মিক শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় আসে দৃঢ়ভাবে রবের আনুগত্য করা ও দৃঢ়ভাবে তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। তাই ধৈর্যই বিজয়ের পথ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আর ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৩৪২]

অর্থাৎ, তাদের সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের সাথে আছেন। অতএব, এই বাক্যে মানুষকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে এবং নিজের শক্তিমত্তা অস্বীকার করতে বলা হচ্ছে। সাধারণত যে কেউ নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে, তাকে সাহায্য করা হয় না। আর সাধারণত যে আল্লাহর জ্ঞান ও ফায়সালার ব্যাপারে ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্ট, তাকে সাহায্য করা হয়। আল্লাহর দয়াশীলতা ও দানশীলতা সন্দেহাতীত।

"মুক্তি আসে বিপদের সাথে" যা প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই আপতিত হয়। বিপদের চরম সময়ই মুক্তির আগমন তরান্বিত হয়। এমন অবস্থায় থাকা ব্যক্তির উচিত ধৈর্যধারণ করা, সাওয়াব আশা করা, অত্যাসন্ন বিপদমুক্তির জন্য অপেক্ষা করা এবং রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করা। তিনি সকল দয়ালুর চেয়ে বেশি দয়ালু, এমনকি বান্দার নিজের পিতামাতার চেয়েও বেশি।

হাদীসটি থেকে বোঝা যায় যে বিপদ-আপদ হলো আসমানি সাহায্যের কারণ। কারণ, বলা হয়েছে "কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা"। বিপদের সময়েই মানুষ আল্লাহর মহত্ত্ব উপলব্ধি করে। আর স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহর সৌন্দর্য উপলব্ধি করে। এক ব্যক্তি বলেছিলেন,

> "যখন তিনি আপনাকে কোনো নিয়ামাত দেন, তখন তাঁর দানশীলতার সাক্ষ্য দিন। আর যখন তিনি কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকেন, তখন তাঁর

[৩৪১] তিরমিযি : ২৩৯৬; ইবনু মাজাহ : ৪০৩১; তিরমিযি একে হাসান গারীব বলেছেন। মুনযিরি, *আত-তারগীব* : খণ্ড ৪, ২৩৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, এর ইসনাদ হাসান বা সহীহ। ইবনু মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শারিয়াহ* : খণ্ড ২, ১৮১ পৃষ্ঠাতে বলেন, এর ইসনাদ জাইয়্যিদ। আলবানি, *আস-সহীহাহ* : ১৪৬ এ একে হাসান বলেছেন। আহমাদ : ২৩৬২৩-২৩৬৩৩-২৩৬৪১ এ মাহমুদ ইবনু লাবিদ ﷺ থেকে একই রকম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যার শব্দমালা, "আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তিনি তাদের পরীক্ষা করেন। যে ধৈর্যধারণ করে, তার জন্য ধৈর্য। আর যে হতাশ হয়, তার জন্য হতাশা।" আরনাউত এর ইসনাদকে জাইয়্যিদ বলেছেন।

[৩৪২] সূরাহ আল-আনফাল, ৮ : ৪৬

ক্ষমতার সাক্ষ্য দিন। প্রতিটি অবস্থায়ই তিনি আপনার যত্ন নিচ্ছেন ও আপনাকে তাঁর আসমানি সাহায্য দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছেন।"

"আর কাঠিন্যের সাথেই আছে সহজতা", অর্থাৎ সহজ করে দেওয়া। প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থাকে বলা হয় ইয়াসার। কারণ, তখন সবকিছু সহজ করে দেওয়া হয়। ইউসরের বিপরীত হলো 'উসর', কাঠিন্য। কুরআনে এই কথাটি পর পর দুই আয়াতে বলা হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় প্রতিটি কষ্টের সাথে দুটি স্বস্তি থাকে। বর্ণিত আছে নবীজি ﷺ বলেন, "কোনো কষ্টই দুটি স্বস্তিকে গ্রাস করতে পারবে না।"[৩৪৩] এ ছাড়া কিছু সাহাবা থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে। এ কথার ভিত্তি হলো যে, এই শব্দটি অনির্দিষ্ট বিশেষ্য হিসেবে এসেছে। এ ক্ষেত্রে ভাষার নিয়ম হলো, দ্বিতীয়বারে উল্লেখকৃত বিষয়টি প্রথমবারে উল্লেখিত বিষয়ের হুবহু অনুরূপ নয়। অন্যদিকে কষ্ট শব্দটি নির্দিষ্ট বিশেষ্য হিসেবে এসেছে, যা একই রকম বা একই জাতের কোনো কিছু বোঝায়। ফলে দুই জায়গাতেই একই জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। যামাখশারি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

বিপদের চরমতম সময়ের সাথে মুক্তির আগমনকে সম্পৃক্ত করার একটি হিকমাহ এই যে, এমন সময়েই বান্দা মাখলুকের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয়। এর বদলে সে আল্লাহর দিকেই মুখ ফেরায় এবং তাঁর উপর নির্ভর করে। এটিই তাওয়াক্কুলের মূলকথা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"যে কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"[৩৪৪]

পরিশেষে হাদীসে যে কাঠিন্যের কথা বলা হয়েছে, তা এই আয়াতে বর্ণিত কাঠিন্য নয় :

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, কাঠিন্য চান না।"[৩৪৫]

---

[৩৪৩] তাবারি; বায়হাকি, *শুয়াব* : ১০০১৩; হাকিম : ৩৯৫০; যাহাবি একে মুরসাল বলেন। একই কথা বলেছেন যায়লাই, *তাখরিজুল কাশশাফ* : খণ্ড ৪, ২৩৫ পৃষ্ঠায়। ইবনু হাজার, *আল-কাফি* : ৩১৯ পৃষ্ঠায় একে মুরসাল বলেন এবং বলেন যে, এর মাওসুল সংস্করণটি যঈফ। *তাগলিক আত-তালিক* : খণ্ড ৪, ৩৭২ পৃষ্ঠায় তিনি আরও বলেন আল-হাসান পর্যন্ত এর ইসনাদ সহীহ। আলবানি, *আয-যঈফাহ* : ৪৩৪২ এ একে যঈফ বলেন।

ইবনু আবি হাতিম : ১৩৩৯৬ এ একে আল-হাসানের উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। ইবনু কাসির বলেন, "এই কথাগুলোর অর্থ হলো উভয় ক্ষেত্রে 'কষ্ট' কথাটি সুনির্দিষ্টতাবাচক উপসর্গ 'আল' এর সাথে যুক্ত। অতএব এটি একবচন। কিন্তু 'স্বস্তি' শব্দটি অনির্দিষ্ট রেখে দেওয়া হয়েছে। অতএব, এটি একাধিকবার ঘটবে। অতএব, দ্বিতীয়বারে উল্লেখিত কষ্ট প্রথমটিকেই বোঝাচ্ছে। তবে স্বস্তির ঘটনা একাধিক।"

[৩৪৪] সূরাহ আত-তলাক, ৬৫ : ৩

হাদীসে যে কাঠিন্যের কথা বলা হয়েছে তা হলো, পার্থিব জীবনের নানা উত্থান-পতন। আর আয়াতে বর্ণিত কাঠিন্য হলো এমন হুকুম-আহকাম, যা পালন করা বান্দার সামর্থ্যের বাইরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"দ্বীনের ভেতর তিনি তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা চাপিয়ে দেননি।"[৩৪৬]

আগের তিনটি বাক্যে মা'আ (সাথে) শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, বিপদ-আপদ ও ধৈর্যের শেষ পর্যায়ই বিজয় ও সাহায্যলাভের প্রথম পর্যায়।

সবশেষে বলতে হয়, এ এক অসাধারণ হাদীস। আল্লাহ তা'আলার অধিকার হেফাজত করা, তাঁর ফায়সালার প্রতি নিজেকে সঁপে দেওয়া, তাঁর তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান, বান্দার সত্তাগত অক্ষমতা ও আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রমাণের এক কেন্দ্রীয় ভিত্তি। এর আলোকে বলা যায়, এই হাদীসটি দ্বীনের অর্ধেক। এমনকি পুরো দ্বীন! কারণ, শরিয়তের সকল নিয়মই আল্লাহ সংক্রান্ত অথবা তিনি ছাড়া অন্যকিছু সংক্রান্ত। এই হাদীস প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে এবং পরোক্ষভাবে অন্য সকল বিষয় নিয়ে আলোকপাত করে। বস্তুত, "আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন" কথাটি দিয়ে এ দুটিই বোঝা যায়। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় পুরো একটি পুস্তিকা রচিত হয়েছে।[৩৪৭]

---

[৩৪৫] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৫
[৩৪৬] সূরাহ আল-হাজ্জ, ২২ : ৭৮
[৩৪৭] লেখক হয়তো ইবনু রজবের পুস্তিকাটির কথাই বলছেন।

পরিশিষ্ট ছয়
ইবনু উসাইমীন ؒ-এর ব্যাখ্যা

রিয়াদুস সলিহীন, ৬২ নং হাদীস। ইমাম নববী ؒ লেখেন :

ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত, "আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম। এ সময় তিনি বলেন, 'বালক, আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিচ্ছি। আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তোমার আগে পাবে। যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। জেনে রেখো, সমগ্র জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। আর যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে।'"[৩৪৮]

তিরমিযিতে এটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন। তিরমিযির বাইরে আরেক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে জানো, তাহলে তোমার দুর্দশার সময় তিনি তোমাকে জানবেন। জেনে রেখো, যা তোমার উপর আপতিত হয়নি, তা কখনোই হওয়ার ছিল না; আর যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল।' এটি শেষ হয় এভাবে, 'জেনে রেখো, বিজয় আসে ধৈর্যের সাথে, মুক্তি আসে বিপদের সাথে, আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা।'"

শারহু রিয়াদুস সলিহীন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৭ এ বলেন,

"আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলাম" অর্থ বাহনে তাঁর পেছনে ছিলেন।

"বালক" (বলা হয়েছে), কারণ তখনো ইবনে আব্বাস ؓ ছিলেন অল্পবয়সী। নবীজি ﷺ-এর মৃত্যুর সময় ইবনে আব্বাস মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেমন পনেরো-ষোলো বছর বা তার কম।

"আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন" এটি পর্বতসম গুরুত্ববহ একটি কথা। "আল্লাহকে হেফাজত করো" তাঁর দ্বীন ও শরিয়ত ঠিক

[৩৪৮] তিরমিযি : ২৫১৬; তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন।

রাখার মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধকৃত বিষয় থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। ইবাদাত, লেনদেন ও সামাজিক আচার-আচরণের ইসলামি নিয়মনীতি শেখার মাধ্যমেও তা হতে পারে। এই অর্জিত জ্ঞান ব্যবহৃত হবে মানুষকে আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লার দিকে ডাকার কাজে। এ সবই আল্লাহকে হেফাজত করার উদাহরণ।

আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই কারও দ্বারা হেফাজত হওয়ার। তাই এ বাক্যের অর্থ হলো আল্লাহর দ্বীনকে হেফাজত করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন।"[৩৪৯]

কারও এমন মনে করা উচিত নয় যে, সে আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহকে সাহায্য করতে পারবে। কারণ, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, প্রাচুর্যশালী, প্রয়োজনের উর্ধ্বে। অন্য আয়াতে তাই তিনি বলেন :

"তোমাদের এমনই নির্দেশ দেওয়া হলো। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন।"[৩৫০]

মানুষ আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না :

"আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞ, সকল শক্তির অধিকারী।"[৩৫১]

অতএব, এ বাক্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে কেউ আল্লাহকে হেফাজত করে, আল্লাহ্ তাকে হেফাজত করবেন। তিনি তার দেহ, সম্পদ, পরিবার ও দ্বীন হেফাজত করবেন। এই শেষেরটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আপনাকে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রোধ করবেন। যতবারই মানুষ হিদায়াত চাইবে, আল্লাহ্ তা তাকে বাড়িয়ে দেবেন :

"যারা সঠিক পথে চলে, আল্লাহ্ তাদের সৎপথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের তাকওয়া দান করেন।"[৩৫২]

মানুষ যতবার ভ্রান্ত পথে চলতে চায় (আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন), ততবার আল্লাহ্ তার ভ্রান্তি বাড়িয়ে দেন, যেমনটি এই হাদীসে এসেছে, "মানুষ

---

[৩৪৯] সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৭
[৩৫০] সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪
[৩৫১] সূরাহ ফাতির, ৩৫ : ৪৪
[৩৫২] সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৭

যখন কোনো পাপ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সে তাওবাহ্ করলে তা মুছে যায়..."[৩৫৩] কিন্তু সে পাপ করতেই থাকলে কালো দাগ বাড়তে বাড়তে পুরো অন্তর ছেয়ে ফেলে এবং তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ রক্ষা করুন।

অতএব, আল্লাহ্ তার দেহ, সম্পদ, পরিবার ও দ্বীন রক্ষা করবেন।

"আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তোমার আগে পাবে।" আরেক বর্ণনায় আছে "তোমার সামনে পাবে।" পূর্বে উল্লেখিত উপায়ে আল্লাহকে হেফাজত করলে তুমি তাকে তোমার সামনে বা আগে পাবে। দুটির একই অর্থ। তা হলো, তিনি তোমাকে সকল কল্যাণের দিকে পথ দেখাতে থাকবেন আর সকল অকল্যাণ দূর করে দিতে থাকবেন। বিশেষত যখন আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে হেফাজত করলে তা অধিক প্রযোজ্য। কারণ, যখন কেউ আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চায় এবং তাঁরই উপর নির্ভর করে, আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যে কেউ এমন অবস্থানে আছে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে তার দরকার হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"হে নবী, তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"[৩৫৪]

"আর তারা যদি তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে আল্লাহ্ই তোমার জন্য যথেষ্ট।"[৩৫৫]

আল্লাহ্ যদি কারও জন্য যথেষ্ট হয়ে যান, তাহলে কোনো অকল্যাণ আর তাকে স্পর্শ করবে না।

"যখন চাইবে, আল্লাহ্র কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহ্র দিকেই ফিরবে।" অর্থাৎ, মাখলুকের উপর নির্ভর করবে না। টাকা-পয়সার অভাবে থাকা ব্যক্তির উচিত আল্লাহ্র কাছেই রিযক চাওয়া। তাহলে এমন জায়গা থেকে তার কাছ থেকে জীবিকা আসতে থাকবে, যা সে কল্পনাও করেনি! অন্যদিকে মানুষের কাছে ভিক্ষা করলে সে তা পেতেও পারে, না-ও পেতে পারে। এ জন্য হাদীসে

---

[৩৫৩] তিরমিযি : ৩৩৩৪, তিনি একে হাসান সহীহ্ বলেছেন; ইবনু মাজাহ : ৪২৪৪; আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু* : খণ্ড ১৪, ৪৮ পৃষ্ঠায় একে সহীহ বলেছেন; আলবানি, *সহীহুত তারগীব* : ৩১৪১ এ একে হাসান বলেছেন। অনুরূপ, *মুসলিম* : ১৪৪; হুযায়ফা ﷺ থেকে বর্ণিত।

[৩৫৪] সূরাহ্ আল-আনফাল, ৮ : ৬৪

[৩৫৫] সূরাহ্ আল-আনফাল, ৮ : ৬২

এসেছে, "দড়ি নিয়ে লাকড়ি জড়ো করে তা বিক্রি করা তোমাদের জন্য ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম। (ভিক্ষা করলে) তারা তোমাকে দিতেও পারে, না-ও দিতে পারে।"[৩৫৬]

যখন চাইবে, আল্লাহর কাছে চাইবে, "হে আল্লাহ, আমাকে রিযক দিন।" "হে আল্লাহ, আমাকে আপনি ছাড়া আর সকলের প্রতি অমুখাপেক্ষী করে দিন" ইত্যাদি। সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রেও এমনই। কোনো সৃষ্টির কাছে সাহায্য না চেয়ে স্রষ্টার কাছে চাইতে হবে। শুধু চরম প্রয়োজনের সময়ই মাখলুকের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে। কিন্তু তখনো মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর সাহায্য আসার জন্য তারা কেবল মাধ্যম। তাদের নিজেদের কোনো ক্ষমতা নেই। তাদের উপর নির্ভর করা যাবে না, নির্ভর করতে হবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার উপর।

এই দুটি বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, মাখলুকের কাছে চাওয়াটা তাওহীদের ঘাটতির লক্ষণ। এ জন্যই ছোট-বড় যেকোনো বিষয়ে মাখলুকের কাছে চাওয়া অপছন্দনীয়। আল্লাহ যদি সাহায্য করতে চান, তাহলে তা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনো না-কোনো মাধ্যমে চলেই আসবে। তিনি আপনার জন্য অসহ্য কোনো বিপদ সরিয়ে দিতে পারেন অথবা তাঁর কোনো মাখলুকের মাধ্যমে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাকে সাহায্যের আসল উৎস হিসেবে ভুলে যাওয়া হারাম।

আজকাল এমন অজ্ঞ লোক দেখা যায়, যারা কুফফারদের অনেক সম্মান করে। কারণ, দরকারের সময় তারা তাদের দেশকে উপকার করেছে। এরা ভুলে যায় যে, কুফফাররা তাদের শত্রু। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা বেশির ভাগ সময়েই কেবল লোক দেখানো। তারা কিয়ামাত পর্যন্ত আপনার শত্রু। এদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা, তাদের সাহায্য করা বা তাদের জন্য দু'আ করা হারাম। এই অজ্ঞদের কেউ কেউ তো কুফফারদের উদ্দেশে পশুও জবাই করতে চায়। আল্লাহ মাফ করুন! আজকাল মুসলিমরা তাদের সন্তানের নাম তাদের নামে রাখে আর তাদের জন্য দু'আ করে। আল্লাহই তাদের আপনার সাহায্যে এগিয়ে এনেছেন, এদের নিজেদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। উপকার বা ক্ষতি করার

---

[৩৫৬] *বুখারি*: ১৪৭০-১৪৮০-২০৭৪-২৩৭৪; আবু হুরায়রা ‎ থেকে বর্ণিত; বুখারি : ১৪৭১-২০৭৫-২৩৫৩; যুবাইর ইবনুল আওয়াম ‎ থেকে বর্ণিত।

মালিক আল্লাহ। তিনিই তাদের আপনাদের উপকারে এনেছেন। যেমনটি হাদীসে এসেছে, "ফাসিক ব্যক্তির মাধ্যমেও আল্লাহর তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন।"[৩৫৭]

আমাদের আল্লাহর রহমত ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। তিনিই তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এনেছেন। জনগণের কাছে আমাদের এই সত্য প্রচার করতে হবে। তারা যখন প্রচার করে যে, কুফফাররা নিজ থেকেই তাদের সাহায্য করেছে এবং তারা তাদের উপর কতটা নির্ভরশীল, তখন আমাদের জন্য এটা ব্যাখ্যা করে দেওয়া জরুরি যে, এ ধরনের মনোভাব ত্রুটিপূর্ণ তাওহীদের লক্ষণ। আল্লাহই ভালো জানেন।

"জেনে রেখো, সমগ্র জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তাহলে ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।" অতএব, কেউ যখন আপনার কোনো সাহায্য করে, তা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন বলেই করে। নবীজি ﷺ বলেননি যে, তারা আপনার কোনো উপকারই করতে পারবে না। তিনি বলেছেন যে, ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

নিঃসন্দেহে মানুষ একে অপরকে সাহায্য করতেই পারে। কিন্তু ততটুকুই করতে পারবে, যতটুকু তাকদীরে লিখিত আছে। তাই এই সাহায্য আসাটা সর্বোপরি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার রহমত। তিনিই কাউকে না কাউকে আপনার সাহায্য করতে বা আপনার প্রতি সদাচরণ করতে অনুমতি দিয়েছেন।

এর উল্টোটিও সত্য। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তার বাইরে মানুষ আপনার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না।

এ ব্যাপারে সত্যিকারের ঈমানের ফলে মানুষ তার রবের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে, তাঁর উপর ভরসা করে, চিন্তিত হয় না। কারণ, সে জানে আল্লাহ যা বিপদ রেখেছেন, সেটিই কেবল আসবে। ফলে সে আল্লাহর প্রতিই আশা করবে এবং তাঁর সাথেই জুড়ে থাকবে। এ কারণেই এই উম্মাহর সালাফগণ যখন আল্লাহর উপর ভরসা রেখেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁদের কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি।

"যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা

---

[৩৫৭] *বুখারি*: ৩০৬২-৪২০৩-৬৬০৬; আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

করছে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।"[৩৫৮]

"কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে।" আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, তা সমাপ্ত হয়ে কলম সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে। আর কোনো সম্পাদনা বা পরিবর্তন হবে না। যা কিছু আপনার উপর আপতিত হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল—যেমনটা বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, "জেনে রেখো, তোমার উপর যা আপতিত হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল"।

"জেনে রেখো" দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে, "বিজয় আসে ধৈর্যের মাধ্যমে।" তাই তুমি যদি ধৈর্য ধরে ও দৃঢ়পদ থেকে আল্লাহর হুকুম মানো এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাও, তিনি তোমাকে বিজয় দান করবেন। আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ, অবাধ্যতা পরিত্যাগে ধৈর্যধারণ এবং বিপদ-আপদের মুখে ধৈর্যধারণ—সবই এই ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত।

শত্রুরা সকল দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। এর ফলে মানুষ হতাশ হয়ে শত্রুকে অজেয় ভেবে জিহাদ ছেড়ে দিতে পারে। জিহাদ ফরয হয়ে গেলে মানুষ আহত ও হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে পারে। অথবা জিহাদ চালিয়ে যেতে যেতেও আহত হতে পারে :

"যদি তোমাদের আঘাত স্পর্শ করে, অনুরূপ আঘাত তো অপর পক্ষকেও স্পর্শ করেছিল..."[৩৫৯]

"এ (শত্রু) জাতির পশ্চাদ্ধাবনে দুর্বলতা দেখাবে না। কেননা, যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তোমাদের মতো তারাও তো কষ্ট পায়। আর তোমরা আল্লাহ হতে এমন কিছু আশা করো, যা তারা আশা করে না।"[৩৬০]

"মুক্তি আসে বিপদের সাথে।" যখনই কোনো কিছু তোমাকে আক্রান্ত করবে এবং বিপদ ঘনীভূত হবে, জেনে রেখো সাহায্য একদম নিকটেই। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাঁর কিতাবে বলেন :

"নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ), যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করেন আর তোমাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? অতি সামান্য

---

[৩৫৮] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১২০
[৩৫৯] সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১৪০
[৩৬০] সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ১০৪

উপদেশই তোমরা গ্রহণ করো।"[৩৬১]

তাই যখন বিপদ চরম আকার ধারণ করবে, জেনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সাহায্যও একদম কাছাকাছি।

"আর কাঠিন্যের সাথে আসে সহজতা।" প্রতিটি কষ্টের সাথেই স্বস্তি আসে; বরং প্রতিটি কষ্টকে ঘিরে আছে দুটি স্বস্তি। আগে একটি, পরে আরেকটি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।"[৩৬২]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "একটি কষ্ট কখনোই দুটি স্বস্তিকে গ্রাস করতে পারবে না।"

মানুষের উচিত এই উপদেশ সব সময় হৃদয়ে ধারণ করা, নবীজি ﷺ তাঁর চাচার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ-কে দিয়েছেন। আল্লাহই সামর্থ্যদাতা।

---

[৩৬১] সূরাহ আন-নামল, ২৭ : ৬২

[৩৬২] সূরাহ আলাম নাশরহ, ৯৪ : ৫-৬

আরবি শব্দের অর্থ

আউলিয়া : 'ওয়ালি'র বহুবচন। বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক। উইলায়াহ শব্দ থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ বিশ্বস্ততা ও নৈকট্য। শত্রুতার বিপরীত।

ইসনাদ : হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারা।

মাজহুল : অপরিচিত। এমন বর্ণনাকারী, যার থেকে কেবল একজনই বর্ণনা করেছেন (মাজহুলুল 'আইন) অথবা যার নির্ভুলতা অজ্ঞাত (মাজহুলুল হাল)। এ ধরনের বর্ণনাকারী থাকলে ইসনাদ যঈফ হয়ে যায়।

মা'রিফাহ : প্রজ্ঞা। আল্লাহকে জানতে পারার জ্ঞান। মা'রিফাতের জ্ঞান লাভকারী আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ সম্পর্কে জানেন এবং এ পথের বাধাগুলোও চেনেন। তিনি আল্লাহর নাম এবং সত্তা ও গুণাবলি জানেন। সকল ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি সত্যবাদিতা ও বিশুদ্ধ নিয়্যাত বজায় রাখেন। তিনি সকল মন্দ কাজ পরিত্যাগ করেন ও সবর অবলম্বন করেন।

মাতরুক : পরিত্যক্ত। এমন বর্ণনাকারী, যিনি মিথ্যা বলা বা ভুল করার ব্যাপারে অভিযুক্ত; অথবা বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন; অথবা বিখ্যাত বর্ণনাকারীদের থেকে এমন বর্ণনা করেন, যা সেই বর্ণনাকারীগণ জানেন না।

মুনকাতি : যেই বর্ণনাসূত্রে সাহাবির আগের বর্ণনাকারীর নাম পাওয়া যায় না।

মুরসাল : অসংযুক্ত। এমন হাদীস, যা একজন তাবি'ঈ সরাসরি মুহাম্মাদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। মাঝে সাহাবির নাম পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ আলিমের মতে এ ধরনের বর্ণনা যঈফ গণ্য হবে।

যঈফ : দুর্বল। এ ধরনের বর্ণনা এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সহীহ বা হাসান বলে গণ্য হয় না। যঈফের মাত্রা বিভিন্ন রকম হতে পারে। সবচেয়ে মারাত্মক পর্যায় হলো মাওযু বা বানোয়াট, জাল।

সহীহ : সঠিক, বিশুদ্ধ। যে হাদীসের ইসনাদ অবিচ্ছিন্ন; বর্ণনাকারী সকলে ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভুল; বর্ণনায় কোনো অনিয়ম (শায) বা লুক্কায়িত ত্রুটি ('ইল্লাহ) নেই। বর্ণনা নিজ থেকে সহীহ হতে পারে, অথবা ত্রুটিপূর্ণ হলেও সমর্থনকারী বর্ণনার কারণে সহীহ গণ্য হতে পারে।

শায : অনিয়মিত। বিশ্বস্ত ও নির্ভুল বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত এমন হাদীস, যা অন্য একাধিক বিশ্বস্ত ও নির্ভুল বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হাদীসের অথবা তাঁর চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ও নির্ভুল একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক এবং সাংঘর্ষিক বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব।

হাফিয : সাধারণত এক লক্ষ হাদীস মুখস্থকারী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়।

হাসান : উত্তম। এ ধরনের হাদীস এমন বর্ণনাকারীদের থেকে প্রাপ্ত, যারা ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু যথেষ্ট নির্ভুল (দ্বাবত) বর্ণনাকারী নন। ফলে হাদীসটি সহীহ পর্যায়ে যেতে পারে না। হাসান হাদীসে কোনো অনিয়ম (শায) বা লুক্কায়িত ত্রুটি ('ইল্লাহ) থাকে না। কোনো বর্ণনা নিজে থেকেই হাসান হতে পারে, অথবা ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সমর্থনকারী প্রমাণের ফলে হাসান হতে পারে।

ইংরেজি অনুবাদকের গ্রন্থপঞ্জি

আল-আজুররি, আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন,

আশ-শারিয়াহ [দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭/১৪১৮, আব্দুল্লাহ ইবনু সুলাইমানের টীকা, ৫+১ খণ্ড]

সিফাতুল গুরাবা [দারুল খুলাফা লিল কিতাবিল ইসলামি, ২য় সংস্করণ, বাদরুদ্দীন আব্দুল্লাহ আল-বদর এর টীকাসহ]

আল-আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন,

যঈফ আবু দাঊদ [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১/১৪১২]

যঈফ ইবনু মাজাহ [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮/১৪০৮]

যঈফ আল-জামিউস সগীর [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯০/১৪১০]

যঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব [মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ২০০০/১৪২১, ২ খণ্ড]

ইলালুল জান্নাহ [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫/১৪০৫

গায়াতুল মারাম [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৪/১৪১৪]

ইরওয়াউল গালীল [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫/১৪০৫, খণ্ড ৮+১]

সহীহ আবু দাঊদ [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯/১৪০৯, ৩ খণ্ড]

সহীহ আদাবুল মুফরাদ [দারুসসিদ্দীক, আল-জুবাইল, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪/১৪১৫]

সহীহ ইবনু মাজাহ [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬/১৪০৭]

সহীহ আল-জামিউস সগীর [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮/১৪০৮, ২ খণ্ড]

সহীহ আত-তিরমিযি [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮/১৪০৮, ৩ খণ্ড]

সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব [মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ২০০০/১৪২১, ৩ খণ্ড]

সিলসিলা আহাদীস আস-সহীহাহ [মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬/১৪০৭, ১০ খণ্ড]

সিলসিলা আহাদীস আয-যঈফাহ [মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯২/১৪১২, ১২ খণ্ড]

তামামুল মিন্নাহ [দারুর রায়াহ, রিয়াদ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯/১৪০৯]

আবু নুয়াইম, আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আসফাহানি,

হিলইয়াতুল আউলিয়া [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭/১৪১৮, মুস্তাফা আতার টীকা, ১২+২ খণ্ড]

আল-আযিম আবাদি, আবুত্তাইয়্যিব মুহাম্মাদ শামসুল হাক,

আওন আলা মাবুদ শারহ সুনান আবু দাঊদ [আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, মদীনা, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৯/১৩৮৮, যার মার্জিনে রয়েছে ইবনুল কাইয়্যিমের *শারহ আবু দাঊদ*, ১৩ খণ্ড]

আহমাদ ইবনু হাম্বল,

মুসনাদ [মুয়াসসারাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫/১৪১৬, শুয়াইব আল-আরনাউতের টীকা, ৪৫+৫ খণ্ড]

আল-বাগাওয়ি, আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইবনু মাসঊদ আল-ফারা,

শারহুস সুন্নাহ [আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩/১৪০৩, শুয়াইব আল-আরনাউতের টীকাসহ, ১৫+১ খণ্ড]

আল-বায়হাকি, আবু বাকর, আহমাদ ইবনুল হুসাইন,

শুয়াবুল ঈমান [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০/১৪১০, মুহাম্মাদ যাগলুলের টিকা সহ, ৭+২ খণ্ড]

দালাইলুন নুবুওয়্যাহ [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫/১৪০৫, সম্পাদক এ. কালাজি, ৬+১ খণ্ড]

সুনানুল কুবরা [দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬/১৪১৬, ১৫ খণ্ড]

আয-যাহাবি, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ :

সিয়ারু আলামিন নুবুলা [মুয়াসসারাতুর রিসালাহ, ১১তম সংস্করণ, ১৯৯৬/১৪১৭, সম্পাদক আল-আরনাউত, ২৩+২ খণ্ড]

তারতিবুল মাওযুয়াত [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪/১৪১৫]

আল-গাযালি, আবু হামীদ,

ইহইয়া উলুমুদ্দীন [দারুল খাইর, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৭/১৪১৭, আল-ইরাকির টীকা, ৫ খণ্ড]

আল-হাকিম, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ,

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সাহীহাইন [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ৪+১ খণ্ড]

ইবনু আব্দুল বার, আবু উমার ইউসুফ,

জামিউল বায়ানুল ইলম [দার ইবনুল জাওযি, দাম্মাম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৮/১৪১৯, আবুল আসবাহাল আয-যুহাইরির টীকা, ২ খণ্ড]

তামহিদ [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৯/১৪১৯, ১০+১ খণ্ড]

ইবনু হাজার, শিহাবুদ্দীন, আহমাদ ইবনু আলি ইবনু মুহাম্মাদ,

ফাতহুল বারি [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, আব্দুল আযীয বিন বাযের টীকা, ১৩+২ খণ্ড]

মাতালিবুল আলিয়াহ [দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭/১৪১৮, গুনাইম ইবনু গুনাইমের টীকা, ৪+১ খণ্ড]

তালখিস আল-হাবির [মুয়াসসারাহ কুরসুবা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫/১৪১৬, ৪ খণ্ড]

ইবনু হিব্বান, আবি হাতিম মুহাম্মাদ,

রওদ্বাতুল উকালা [দারুশ শারিফ, রিয়াদ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭/১৪১৮, ইবরাহীম আল-হাযিমির টীকা]

সহীহ [মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭/১৪১৮, আল-আরনাউতের টীকাসহ, ১৬+২ খণ্ড]

ইবনুল জাওযি, আবুল ফারাহ আব্দুর রহমান,

আল-মাওযুয়াত [দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩/১৪০৩, ৩ খণ্ড]

ইবনু কাসির, আবুল ফিদা ইসমাঈল,

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া [দার ইহইয়া আত-তুরাসুল আরাবি, বৈরুত, ১৯৯৩/১৪১৩, ১৪+১ খণ্ড]

ইবনুল কাইয়্যিম, শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ,

আল-ফাওয়াইদ [দারুল কিতাবুল আরাবি, বৈরুত, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৩/১৪১৪, মুহাম্মাদ উসমানের টীকাসহ]

মাদারিজুস সালিকীন [দারুল কিতাবুল আরাবি, বৈরুত, ৩ খণ্ড]

ইবনু কুতাইবাহ,

তাওয়ীল মুখতালিফুল আহাদীস [দারুল কিতাবুল আরাবি, বৈরুত]

ইবনু রজব, আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ যাইনুদ্দীন,

ফাযলুল ইলমুস সালাফ আলাল খালাফ [দারুল আম্মার, আম্মান, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬/১৪০৬, আলি আহসানের টীকাসহ]

ফাযলুল ইলমুস সালাফ আলাল খালাফ [দারুল আরকাম, কুয়েত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩/১৪০৪, আহমাদ আন-নাজমির টীকাসহ]

ফাতহুল বারি শারহ সহীহুল বুখারি [দার ইবনুল জাওযি, ২য় সংস্করণ, ১৪২২, সম্পাদক টি ইওয়াদুল্লাহ, ৭ খণ্ড]

আল-হাকিম, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ,

আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০/১৪১১, মুস্তাফা আতার টীকাসহ, ৪+১ খণ্ড]

আল-হায়সামি, নূরুদ্দীন আলি ইবনু আবু বাকর,

মাজমাউয যাওয়াইদ [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত]

আল-ইজলুনি, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ,

কাশফুল খফা [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮/১৪০৮]

আল-ইরাকি, আবুল ফাযল যাইনুদ্দীন আব্দুর রহীম,

আল-মুগনি আন হামালুল আসফার [দারুত তাবারিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫/১৪১৫, আশরাফ আব্দুল মাকসুদের টীকাসহ, ২+১ খণ্ড]

আল-মুবারাকপুরি, আবুল আলা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান,

তুহফাতুল আহওয়াযি শারহ সুনানুত তিরমিযি [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০/১৪১০, ১০ খণ্ড]

আল-মুনাওয়ি, মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ,

ফাইযুল কাদির [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪/১৪১৫, আহমাদ আব্দুস সালামের টীকাসহ, ৬ খণ্ড]

আন-নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ,

শারহ সহীহ মুসলিম [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫/১৪১৫, ১৮+১ খণ্ড]

আস-সাখাওয়ি, মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান,

মাকাসিদ আল-হাসানাহ [দারুল কিতাবুল আরাবি, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪/১৪১৪, সম্পাদক এম উসমান]

আস-সুয়ুতি, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকর,

আদ্দুররুল মানসুর [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ২০০০/১৪২১, ৬+১ খণ্ড]

আল-লালিউল মাসনুয়াহ [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬/১৪১৭, ২+১ খণ্ড]

আত-তাহাবি, আবু জাফার আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ,

শারহ মুশকিলুল আসার [মুয়াসসারাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪/১৪১৫, সম্পাদক শুয়াইব আল-আরনাউত, ১৫+১ খণ্ড]

আয-যুরকানি, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকি,

শারহ মুয়াত্তা মালিক [দারুল কুতুবুল ইল্মিয়্যাহ, বৈরুত, ৪ খণ্ড]

লেখক পরিচিতি

হাফিয আবুল ফারাজ ইবনু রজব আল-হাম্বলি

তিনি হলেন আল-ইমাম ওয়াল-হাফিয যাইনুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনুল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবুল বারাকাত মাসউদ আস-সুলামি আল-হাম্বলি আদ-দিমাশকি। তাঁর উপনাম আবুল ফারাজ এবং ডাকনাম ইবনু রজব। এটা তাঁর দাদারও ডাকনাম, যিনি রজব মাসে জন্ম নিয়েছিলেন।

ইবনু রজব ৭৩৬ হিজরি সনে বাগদাদে এক জ্ঞানীগুণী ও দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও লালিত-পালিত হন। দামেস্কের হুমারিয়্যাহতে ৭৯৫ হিজরি চৌঠা রমাদান সোমবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠতম আলিমদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। দামেস্কে তিনি ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, যাইনুদ্দীন আল-ইরাকি, ইবনুন নাকিব, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আল-খাব্বায, দাউদ বিন ইবরাহীম আল-আত্তার, ইবনু কাতি আল-জাবাল এবং আহমাদ ইবনু আব্দুল হাদি আল-হাম্বলির নিকট শিক্ষালাভ করেন। মক্কায় তিনি আল-ফাখর উসমান ইবনু ইউসুফ আল-নুওয়াইরির কাছ থেকে, আল-কুদসে (জেরুজালেম) আল-হাফিয আল-আলাই এর কাছ থেকে এবং মিসরে সদরুদ্দীন আবুল ফাতহ আল-মাইদুমি ও নাসিরুদ্দীন ইবনুল মুলুকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন।

অনেক ত্বলিবুল ইলম তাঁর অধীনে পড়াশোনা করার জন্য তাঁর কাছে আসেন। তাঁর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আবু বাকর ইবনু আলি আল-হাম্বলি, আবুল ফাদল আহমাদ ইবনু নাসর ইবনু আহমাদ, দাউদ বিন সুলায়মান আল-মাওসিলি, আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুকরি, যাইনুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনু সুলাইমান ইবনু আবুল কারাম, আবু যার আয-যারকাশি, আল-কাদি আলাউদ্দীন ইবনু লাহাম আল-বালি এবং আহমাদ ইবনু সাইফুদ্দীন আল-হামাওয়ি।

ইলম অন্বেষণের পেছনে ইবনু রজব নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। জীবনের বিরাট সময়কাল তিনি গবেষণা, লেখালেখি, রচনা, শিক্ষকতা ও ফাতওয়া প্রদানের পেছনে ব্যয় করেন।

অনেক আলিম তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান, অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও হাম্বলি মাযহাবের উপর দক্ষতার প্রশংসা করেন। ইবনু কাদি শুহবাহ তাঁর ব্যাপারে বলেন, "তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করে দক্ষ হয়ে ওঠেন। মাযহাবের জ্ঞানে তুখোড় দক্ষতা অর্জন করা পর্যন্ত তিনি নিজেকে এতে ব্যাপকভাবে ব্যস্ত রাখেন। কিতাবের জ্ঞান, হাদীসের অর্থ, বানোয়াট হাদীসের ত্রুটিবিচ্যুতি অন্বেষণে তিনি নিজেকে নিবেদিত রাখেন।"[৩৬৩]

ইবনু হাজার তাঁর ব্যাপারে বলেন, "তিনি হাদীসশাস্ত্রে উঁচু মানের দক্ষ ছিলেন। বর্ণনাকারীর নাম ও জীবনী, হাদীসের বর্ণনাসূত্র ও অর্থের ব্যাপারে তিনি খুবই জ্ঞানী ছিলেন।"[৩৬৪]

ইবনু মুফলিহ তাঁর ব্যাপারে বলেন, "তিনি ছিলেন আশ-শাইখ, মহান আলিম, আল-হাফিয, আয-যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ), হাম্বলি মাযহাবের শাইখ এবং অনেক উপকারী কাজের রচয়িতা।"[৩৬৫]

তাঁর রচিত কল্যাণময় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে সুবিখ্যাত *আল-কাওয়ায়িদুল কুবরা ফিল-ফুরূ*। এই কিতাবের ব্যাপারে বলা হয়, "এটি হলো এই যুগের বিস্ময়গুলোর মাঝে একটি।"[৩৬৬] *সুনানে তিরমিযি* কিতাবের উপর লেখা তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ এত অসাধারণ ছিল যে, একই বইয়ের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার সময় আল-ইরাকির মতো জ্ঞানী ব্যক্তিও এর সাহায্য নেন। অথচ এই আল-ইরাকির ব্যাপারেই ইবনু হাজার বলেছেন, "তিনি ছিলেন তাঁর যুগের বিস্ময়"।

এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যা করে তিনি অনেকগুলো মনোগ্রাফ রচনা করেন। যেমন : *শারহ হাদীস মা যিবানি জাইয়ান উরসিলা ফি গনাম*, *ইখতিয়ারুল আওলা শারহ হাদীস ইখতিসামুল মালাউল আলা*, *নূরুল ইকতিবাস ফি শারহ ওয়াসিয়্যাতুন নাবী লি ইবনু আব্বাস* এবং *কাশফুল কুরবাহ ফি ওয়াসফি হালি আহলিল গুরবাহ*।

তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *তাফসীর সূরাতুল ইখলাস*, *তাফসীর সূরাতুল ফাতিহা*, *তাফসীর সূরাতুন নাসর* এবং *আল-ইস্তিগনা বিল কুরআন*।

হাদীসের উপর তাঁর কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে *শারহ ইলালুত তিরমিযি*, *ফাতহুল বারি শারহ সাহীহুল বুখারি* এবং *জামিউল উলুম ওয়াল হিকমাহ*।

---

[৩৬৩] ইবনে কাদি আল-শুহবাহ, তারিখ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯৫
[৩৬৪] ইবনু হাজার, ইনবাউল গামর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬০
[৩৬৫] আল মাকসাদ আল আরশাদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮১
[৩৬৬] ইবনু আব্দুল হাদি, দায়ল'আলা তাবাকাত ইবনু রজব, পৃষ্ঠা ৩৮

ফিকহের উপর তাঁর কয়েকটি কাজ হলো : *আল-ইস্তিখরাজ ফি আহকামুল খরাজ* এবং *আল-কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যাহ*।

ইতিহাস ও জীবনী-সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত কর্ম *যাইল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন "আমি নবীজি ﷺ-এর পেছনে বসে থাকা অবস্থায় তিনি বললেন, 'হে বালক, তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিই, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার উপকার সাধন করবেন?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি ﷺ বললেন, 'আল্লাহকে হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাহলে তাঁকে তুমি তোমার সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে জেনো, তাহলে তোমার বিপদের সময় তিনি তোমাকে জানবেন। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহরই কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে। যা যা ঘটবে, (তা লেখার পর) কলম শুকিয়ে গেছে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একত্র হয়ে যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তাহলেও তারা তা করতে সমর্থ হবে না। জেনে রেখো, তুমি যা অপছন্দ করো তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মধ্যে রয়েছে মহাকল্যাণ। বিজয় রয়েছে ধৈর্যের মধ্যে; কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি; আর কাঠিন্যের সাথে রয়েছে সহজতা।"

(আহমাদ : ২৮০৩; সহীহ)